

আশ্রমের রূপ ও বিকাশ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আশ্রমের রূপ
ও বিকাশ

আশ্রমের রূপ ও বিকাশ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়

শান্তিনিকেতন-বিদ্যালয়ের পঞ্চাশবর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত
পরিবর্ধিত সংস্করণ ৭ পৌষ ১৩৫৮
প্রথম প্রকাশ আষাঢ় ১৩৪৮

শ্রীনন্দলাল বসু কর্তৃক চিত্রালংকৃত

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা

মুদ্রাকর শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস, ৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা

'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ' বিশ্বভারতী পুস্তিকামালার অন্তর্গত হইয়া ১৩৪৮ সালের আষাঢ় মাসে প্রকাশিত হয়।

ইহার প্রথম প্রবন্ধটি 'আশ্রমের শিক্ষা' নামে ১৩৪৩ সালের আশ্বিন-সংখ্যা 'প্রবাসী'তে মুদ্রিত হয়, এবং নিউ এডুকেশন ফেলোশিপ-প্রকাশিত 'শিক্ষার ধারা' পুস্তিকার (১৩৪৩) অন্তর্গত হয়। রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষা' গ্রন্থের ১৩৫১ ও তৎপরবর্তী সংস্করণেও ইহা মুদ্রিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় প্রবন্ধটি 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ' পুস্তিকায় প্রথম প্রকাশিত ও তাহার কিছুকাল পূর্বে লিখিত।

১৩৪০ সালের আশ্বিন মাসে প্রকাশিত ও শান্তিনিকেতনে পঠিত 'আশ্রমবিদ্যালয়ের সূচনা' ইতিপূর্বে কোনো গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। উহা 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ' পুস্তিকার বর্তমান সংস্করণে তৃতীয় প্রবন্ধ-রূপে মুদ্রিত হইল।



প্রাচীন ভারতের তপোবন জিনিসটির ঠিক বাস্তব রূপ কী তার স্পষ্ট ধারণা আজ অসম্ভব। মোটের উপর এই বুঝি যে আমরা যাঁদের ঋষিমুনি বলে থাকি অরণ্যে ছিল তাঁদের সাধনার স্থান। সেই সঙ্গেই ছিল স্ত্রী পরিজন নিয়ে তাঁদের গার্হস্থ্য। এই সকল আশ্রমে কাম ক্রোধ রাগ দ্বেষের আলোড়ন যথেষ্ট ছিল, পুরাণের আখ্যায়িকায় তার বিবরণ মেলে।

কিন্তু তপোবনের যে চিত্রটি স্থায়ীভাবে রয়ে গেছে পরবর্তী ভারতের চিত্তে ও সাহিত্যে, সেটি হচ্ছে কল্যাণের নির্মল সুন্দর মানসমূর্তি, বিলাস-মোহমুক্ত বলবান আনন্দের মূর্তি। অব্যবহিত পারিপার্শ্বিকের জটিলতা আবিলতা অসম্পূর্ণতা থেকে পরিত্রাণের আকাঙ্ক্ষা এই কাম্যলোক সৃষ্টি করে তুলেছিল ইতিহাসের অস্পষ্ট স্মৃতির উপকরণ নিয়ে। পরবর্তীকালে কবিদের বেদনার মধ্যে যেন

দেশব্যাপী একটি নির্বাসন-দুঃখের আভাস পাওয়া যায়, কালিদাসের রঘুবংশে তার সুস্পষ্ট নিদর্শন আছে। সেই নির্বাসন তপোবনের উপকরণবিরল শান্ত সুন্দর যুগের থেকে ভোগৈশ্বর্যজালে বিজড়িত তামসিক যুগে।

কালিদাসের বহুকাল পরে জন্মেছি, কিন্তু এই ছবি রয়ে গেছে আমারও মনে। যৌবনে নিভৃতে ছিলুম পদ্মাবক্ষে সাহিত্যসাধনায়। কাব্যচর্চার মাঝখানে কখন এক সময়ে সেই তপোবনের আহ্বান আমার মনে এসে পৌঁচেছিল। ভাববিলীন তপোবন আমার কাছ থেকে রূপ নিতে চেয়েছিল আধুনিককালের কোনো একটি অনুকূল ক্ষেত্রে। যে প্রেরণা কাব্যরূপ-রচনায় প্রবৃত্ত করে, এর মধ্যে সেই প্রেরণাই ছিল—কেবলমাত্র বাণীরূপ নয়, প্রত্যক্ষরূপ।

অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে আমার মনে এই কথাটি জেগে উঠেছিল, ছেলেদের মানুষ করে তোলবার জন্যে যে-একটা যন্ত্র তৈরি হয়েছে, যার নাম ইস্কুল, সেটার ভিতর দিয়ে মানবশিশুর শিক্ষার সম্পূর্ণতা হতেই পারে না। এই শিক্ষার জন্যে আশ্রমের দরকার, যেখানে আছে সমগ্রজীবনের সজীব ভূমিকা।

তপোবনের কেন্দ্রস্থলে আছেন গুরু। তিনি যন্ত্র নন, তিনি মানুষ। নিষ্ক্রিয়ভাবে মানুষ নন,

সক্রিয়ভাবে; কেননা মনুষ্যত্বের লক্ষ্য-সাধনে তিনি প্রবৃত্ত। এই তপস্যার গতিমান ধারায় শিষ্যদের চিত্তকে গতিশীল করে তোলা তাঁর আপন সাধনারই অঙ্গ। শিষ্যদের জীবন এই যে প্রেরণা পাচ্ছে সে তাঁর অব্যবহিত সঙ্গ থেকে। নিত্যজাগরূক মানব-চিত্তের এই সঙ্গ জিনিসটিই আশ্রমের শিক্ষায় সব চেয়ে মূল্যবান উপাদান—অধ্যাপনার বিষয় নয়, পদ্ধতি নয়, উপকরণ নয়। গুরুর মন প্রতি মুহূর্তে আপনাকে পাচ্ছে বলেই আপনাকে দিচ্ছে। পাওয়ার আনন্দ দেওয়ার আনন্দেই নিজের সত্যতা সপ্রমাণ করে, যেমন যথার্থ ঐশ্বর্যের পরিচয় ত্যাগের স্বাভাবিকতায়।

পণ্য উৎপাদন ব্যাপারটাকে বিপুল ও দ্রুত করবার জন্যেই আধুনিককালে যন্ত্রযোগে ভূরি উৎপাদনের প্রবর্তন। পণ্যবস্তু প্রাণবান নয়, হাইড্রলিক জাঁতার চাপে তাদের কোনো কষ্ট নেই। কিন্তু শিক্ষা ব্যাপারটা ভূরি উৎপাদনের যান্ত্রিক চেষ্টায় নীরস নৈর্ব্যক্তিক প্রণালীতে মানুষের মনকে পীড়িত করবেই। ধরে নিতে হবে আশ্রমের শিক্ষা সেই শিক্ষার কারখানাঘর হবে না। এখানে প্রত্যেক ছাত্রের মনের উপর শিক্ষকের প্রাণগত স্পর্শ থাকবে, তাতে উভয় পক্ষেরই আনন্দ।

একদা একজন জাপানী ভদ্রলোকের বাড়িতে ছিলাম, বাগানের কাজে তাঁর ছিল বিশেষ শখ। তিনি বলেছিলেন, আমি বৌদ্ধ, মৈত্রীর সাধক। আমি ভালোবাসি গাছপালা, ওদের মধ্যে এই ভালোবাসার অনুভূতি প্রবেশ করে, ওদের কাছ থেকে সেই ভালোবাসারই পাই প্রতিদান। কেবলমাত্র নিপুণ মালীর সঙ্গে প্রকৃতির এই স্বতঃ-আনন্দের যোগ থাকে না। বলা বাহুল্য মানুষ-মালীর সম্বন্ধে এ কথা যে সম্পূর্ণ সত্য তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মনের সঙ্গে মন মিলতে থাকলে আপনি জাগে খুশি। সেই খুশি সৃজন-



শক্তিশীল। আশ্রমের শিক্ষাদান এই খুশির দান। যাঁদের মনে কর্তব্যবোধ আছে কিন্তু খুশি নেই তাঁদের দোসরা পথ।

পুরাকালে আমাদের দেশের গৃহস্থ ধনের দায়িত্ব স্বীকার করতেন। যথাকালে যথাস্থানে যথাপাত্রে দান করার দ্বারা তিনি নিজেকেই জানতেন

সার্থক। তেমনি যিনি জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন, জ্ঞান বিতরণের দায়িত্ব তিনি স্বতই গ্রহণ করতেন। তিনি জানতেন, যা পেয়েছেন তা দেবার সুযোগ না পেলে পাওয়াই থাকে অসম্পূর্ণ। গুরুশিষ্যের মধ্যে এই পরস্পরসাপেক্ষ সহজ সম্বন্ধকেই আমি বিদ্যাদানের প্রধান মাধ্যস্থ্য বলে জেনেছি।

আরো একটি কথা আমার মনে ছিল। গুরুর অন্তরে ছেলেমানুষটি যদি একেবারে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায় তা হলে তিনি ছেলেদের ভার নেবার অযোগ্য হন। শুধু সামীপ্য নয়, উভয়ের মধ্যে প্রকৃতিগত সাযুজ্য ও সাদৃশ্য থাকা চাই। নইলে দেনা-পাওনায় নাড়ীর যোগ থাকে না। নদীর সঙ্গে যদি প্রকৃত শিক্ষকের তুলনা করি তবে বলব, কেবল ডাইনে বাঁয়ে কতকগুলো বুড়ো বুড়ো উপ-নদী-যোগেই তিনি পূর্ণ নন। তাঁর প্রথম আরম্ভের লীলাচঞ্চল কলহাস্যমুখর ঝরনার প্রবাহ পাথর-গুলোর মধ্যে হারিয়ে যায় নি। যিনি জাত-শিক্ষক ছেলেদের ডাক পেলেই তাঁর আপন ভিতরকার আদিম ছেলেটা আপনি ছুটে আসে। মোটা গলার ভিতর থেকে উচ্ছ্বসিত হয় প্রাণে-ভরা কাঁচা হাসি। ছেলেরা যদি কোনো দিক থেকেই তাঁকে স্বশ্রেণীর জীব বলে চিনতে না পারে, যদি মনে করে লোকটা

যেন প্রাগৈতিহাসিক মহাকায় প্রাণী, তবে খাবার আড়ম্বর দেখে নির্ভয়ে সে তাঁর কাছে হাত বাড়াতেই পারবে না। সাধারণত আমাদের গুরুরা প্রবীণতা সপ্রমাণ করতেই চান, প্রায়ই ওটা শস্তায় কর্তৃত্ব করবার প্রলোভনে, ছেলেদের আঙিনায় চোপদার না নিয়ে এগোলে সম্ভ্রম নষ্ট হবার ভয়ে তাঁরা সতর্ক। তাই পাকা শাখায় কচি শাখায় ফুল ফোটাবার ফল ফলাবার মর্মগত সহযোগ রুদ্ধ হয়ে থাকে।

আর-একটা গুরুতর কথা আমার মনে ছিল। ছেলেরা বিশ্বপ্রকৃতির অত্যন্ত কাছের সামগ্রী। আরামকেদারায় তারা আরাম চায় না, গাছের ডালে তারা চায় ছুটি। বিরাট প্রকৃতির অন্তরে আদিম প্রাণের বেগ নিগূঢ়ভাবে চঞ্চল, শিশুর প্রাণে সেই বেগ গতিসঞ্চার করে। জীবনের আরম্ভে অভ্যাসের দ্বারা অভিভূত হবার আগে কৃত্রিমতার জাল থেকে ছুটি পাবার জন্যে ছেলেরা ছট্‌ফট্ করতে থাকে, সহজ প্রাণলীলার অধিকার তারা দাবি করে বয়স্কদের শাসন এড়িয়ে। আরণ্যক ঋষিদের মনের মধ্যে ছিল চিরকালের ছেলে, তাই কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণের অপেক্ষা না রেখে তাঁরা বলেছিলেন, যদিদং কিঞ্চ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্—এই

যা-কিছু সমস্তই প্রাণ হতে নিঃসৃত হয়ে প্রাণেই কম্পিত হচ্ছে। এ কি বর্গ্‌সঁ-এর বচন। এ মহান শিশুর বাণী। বিশ্বপ্রাণের এই স্পন্দন লাগতে দাও ছেলেদের দেহে মনে, শহরের বোবা কালা মরা দেওয়ালগুলোর বাইরে। আমাদের আশ্রমের ছেলেরা



এই প্রাণময়ী প্রকৃতিকে কেবল যে খেলায় ধুলায় নানা রকম করে কাছে পেয়েছে তা নয়, আমি গানের রাস্তা দিয়ে নিয়ে গেছি তাদের মনকে প্রকৃতির রঙমহলে।

তার পরে আশ্রমের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার কথা। মনে পড়ছে, কাদম্বরীতে একটি বর্ণনা আছে—তপোবনে আসছে সন্ধ্যা, যেন গোষ্ঠে-ফিরে-আসা

পাটলী হোমধেনুটির মতো। শুনে মনে পড়ে যায় সেখানে গোরু চরানো, গো দোহন, সমিধ্ আহরণ, অতিথি-পরিচর্যা, আশ্রম-বালকবালিকাদের দিন-কৃত্য। এই সব কর্মপর্যায়ের দ্বারা তপোবনের সঙ্গে তাদের নিত্য-প্রবাহিত জীবনের যোগধারা। প্রাণায়ামের ফাঁকে ফাঁকে কেবলি যে সামমন্ত্র আবৃত্তি তা নয়, সহকারিতার সখ্য বিস্তারে সকলে মিলে আশ্রমের সৃষ্টিকার্য পরিচালন; তাতে করে আশ্রম হত আশ্রমবাসীদের নিজ হাতের সম্মিলিত রচনা, কর্মসমবায়ে। আমাদের আশ্রমে এই সতত-উদ্যমশীল কর্মসহযোগিতা কামনা করেছি। মাস্টারমশায় গোরু চরাবার কাজে ছেলেদের লাগালে তারা খুশি হত সন্দেহ নেই, দুর্ভাগ্যক্রমে এ যুগে তা সম্ভব হবে না। তবু শরীর মন খাটাবার কাজ বিস্তর আছে যা এ যুগে মানাত। কিন্তু হায় রে, পড়া মুখস্থ সর্বদাই থাকে বাকি, পাতা ভরে রয়েছে কন্‌জুগেশন্ অফ ইংরেজি ভর্ব্‌স্। তা হোক, আমি যে বিদ্যানিকেতনের কল্পনা করেছি পড়া-মুখস্থর কড়া পাহারা ঠেলেঠুলে তার মধ্যে পরস্পরের সেবা এবং পরিবেশ-রচনার কাজকে প্রধান স্থান দিয়েছি।

আশ্রমের শিক্ষাকে যথার্থভাবে সফল করতে হলে

জীবনযাত্রাকে যথাসম্ভব উপকরণবিরল করে তোলা অত্যাবশ্যক হয়ে ওঠে। মানুষের প্রকৃতিতে যেখানে জড়তা আছে সেখানে প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা কুশ্রী উচ্ছৃঙ্খল এবং মলিন হতে থাকে, সেখানে তার স্বাভাবিক বর্বরতা প্রকাশে বাধা পায় না। ধনী-সমাজে আন্তরিক শক্তির অভাব থাকলেও বাহ্যিক উপকরণ-প্রাচুর্যে কৃত্রিম উপায়ে এই দীনতাকে চাপা দিয়ে রাখা যায়। আমাদের দেশে প্রায় সর্বত্রই ধনী-গৃহে সদর-অন্দরের প্রভেদ দেখলে এই প্রকৃতিগত তামসিকতা ধরা পড়ে।

আপনার চার দিককে নিজের চেষ্টায় সুন্দর সুশৃঙ্খল ও স্বাস্থ্যকর করে তুলে একত্র বাসের সতর্ক দায়িত্বের অভ্যাস বাল্যকাল থেকেই সহজ করে তোলা চাই। একজনের শৈথিল্য অন্যের অসুবিধা অস্বাস্থ্য ও ক্ষতির কারণ হতে পারে এই বোধটি সভ্য জীবনযাত্রার ভিত্তিগত। সাধারণত আমাদের দেশের গার্হস্থ্যের মধ্যে এই বোধের ত্রুটি সর্বদাই দেখা যায়।

সহযোগিতার সভ্যনীতিকে সচেতন করে তোলা আশ্রমের শিক্ষার প্রধান সুযোগ। এই সুযোগটিকে সফল করবার জন্যে শিক্ষার প্রথম বর্গে উপকরণ-লাঘব অত্যাবশ্যক। একান্ত বস্তুপরায়ণ স্বভাবে

প্রকাশ পায় চিত্তবৃত্তির স্থূলতা। সৌন্দর্য এবং সুব্যবস্থা মনের জিনিস। সেই মনকে মুক্ত করা চাই কেবল আলস্য এবং অনৈপুণ্য থেকে নয়, বস্তুলুব্ধতা থেকে। রচনাশক্তির আনন্দ ততই সত্য হয় যতই তা জড় বাহুল্যের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। বিচিত্র উপকরণকে সুবিহিতভাবে ব্যবহার করবার সুযোগ উপযুক্ত বয়সে ও অবস্থায় লাভ করবার সুযোগ অনেকের ঘটতে পারে, কিন্তু বাল্যকাল থেকেই ব্যবহার্য বস্তুগুলিকে সুনিয়ন্ত্রিত



করবার আত্মশক্তিমূলক শিক্ষাটা আমাদের দেশে অত্যন্ত উপেক্ষিত হয়ে থাকে। সেই বয়সেই প্রতিদিন অল্প কিছু সামগ্রী যা হাতের কাছে পাওয়া যায় তাই দিয়েই সৃষ্টির আনন্দকে সুন্দর করে উদ্ভাবিত করবার চেষ্টা যেন নিরলস হতে পারে এবং সেই সঙ্গেই সাধারণের সুখ স্বাস্থ্য সুবিধা -বিধানের কর্তব্যে ছাত্রেরা যেন আনন্দ পেতে শেখে এই আমার কামনা।

আমাদের দেশে ছেলেদের আত্মকর্তৃত্বের বোধকে

অসুবিধাজনক আপদজনক ও ঔদ্ধত্য মনে করে সর্বদা দমন করা হয়। এতে করে পরনির্ভরতার লজ্জা তাদের চলে যায়, পরের প্রতি দাবির আবদার তাদের বেড়ে যায়, ভিক্ষুকতার ক্ষেত্রেও তাদের অভিমান প্রবল হতে থাকে, আর পরের ত্রুটি নিয়ে কলহ করেই তারা আত্মপ্রসাদ লাভ করে। এই লজ্জাকর দীনতা চার দিকে সর্বদাই দেখা যাচ্ছে। এর থেকে মুক্তি পাওয়াই চাই। ছাত্রদের স্পষ্ট বোঝা উচিত, যেখানে নালিশ কথায় কথায় মুখর হয়ে ওঠে সেখানে সঞ্চিত আছে নিজেরই লজ্জার কারণ, আত্মসম্মানের বাধা। ত্রুটি সংশোধনের দায় নিজে গ্রহণ করার উদ্যম যাদের আছে, খুঁতখুঁত করার কাপুরুষতায় তারা ধিক্কার বোধ করে। আমার মনে আছে ছাত্রদের প্রাত্যহিক কাজে যখন আমার যোগ ছিল তখন একদল বয়স্ক ছাত্র আমার কাছে নালিশ করেছিল যে, অন্নভরা বড়ো বড়ো ধাতুপাত্র পরিবেশনের সময় মেজের উপর দিয়ে টানতে টানতে তার তলা ক্ষয়ে গিয়ে ঘর-ময় নোংরামির সৃষ্টি হয়। আমি বললুম, তোমরা পাচ্ছ দুঃখ, অথচ স্বয়ং এর সংশোধনের চিন্তামাত্র তোমাদের মনে আসে না, তাকিয়ে আছ আমি এর প্রতিবিধান করব। এই সামান্য কথাটা তোমাদের বুদ্ধিতে আসছে না যে,

ঐ পাত্রটার নীচে একটা বিড়ে বেঁধে দিলেই ঘর্ষণ নিবারণ হয়। তার একমাত্র কারণ, তোমরা জান নিষ্ক্রিয়ভাবে ভোক্তৃত্বের অধিকারই তোমাদের আর কর্তৃত্বের অধিকার অন্যের। এইরকম ছেলেই বড়ো হয়ে সকল কর্মেই কেবল খুঁতখুঁতের বিস্তার ক'রে নিজের মজ্জাগত অকর্মণ্যতার লজ্জাকে দশ দিকে গুঞ্জরিত করে তোলে।

এই বিদ্যালয়ের প্রথম থেকেই আমার মনে ছিল আশ্রমের নানা ব্যবস্থার মধ্যে যথাসম্ভব পরিমাণে ছাত্রদের কর্তৃত্বের অবকাশ দিয়ে অক্ষম কলহপ্রিয়তার ঘৃণ্যতা থেকে তাদের চরিত্রকে রক্ষা করব।

উপকরণের বিরলতা নিয়ে অসংগত ক্ষোভের সঙ্গে অসন্তোষ-প্রকাশের মধ্যেও চরিত্রদৌর্বল্য প্রকাশ পায়। আয়োজনের কিছু অভাব থাকাই ভালো, অভ্যস্ত হওয়া চাই স্বল্পে, অনায়াসে প্রয়োজনের জোগান দেওয়ার দ্বারা ছেলেদের মনটাকে আদুরে করে তোলা তাদের ক্ষতি করা। সহজেই তারা যে এত কিছু চায় তা নয়, তারা আত্মতৃপ্ত; আমরাই বয়স্কলোকের চাওয়াটা কেবলি তাদের উপর চাপিয়ে তাদেরকে বস্তুর নেশা-গ্রস্ত করে তুলি। গোড়া থেকেই শিক্ষার প্রয়োজন এই কথা ভেবে যে, কত অল্প নিয়ে চলতে পারে। শরীর মনের শক্তির

সম্যক্‌রূপে চর্চা সেইখানেই ভালো করে সম্ভব যেখানে বাইরের সহায়তা অনতিশয়। সেখানে মানুষের আপনার সৃষ্টি-উদ্যম আপনি জাগে। যাদের না জাগে প্রকৃতি তাদেরকে আবর্জনার মতো ঝেঁটিয়ে ফেলে দেয়। আত্মকর্তৃত্বের প্রধান লক্ষণ সৃষ্টিকর্তৃত্ব। সেই মানুষই যথার্থ স্বরাট্‌ যে আপনার রাজ্য আপনি সৃষ্টি করে। আমাদের দেশে মেয়েদের হাতে অতিলালিত ছেলেরা মনুষ্যোচিত সেই আত্মপ্রবর্তনার চর্চা থেকে প্রথম হতেই বঞ্চিত। তাই আমরা অন্যদের শক্ত হাতের চাপে অন্যদের ইচ্ছার নমুনায় রূপ নেবার জন্যে অত্যন্ত কাদামাখা-ভাবে প্রস্তুত। তাই আপিসের নিম্নতম বিভাগে আমরা আদর্শ কর্মচারী।

এই উপলক্ষে আর একটা কথা আমার বলবার আছে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে শরীর-তন্তুর শৈথিল্য বা অন্য যে কারণবশতই হোক আমাদের মানসপ্রকৃতিতে ঔৎসুক্যের অত্যন্ত অভাব। একবার আমেরিকা থেকে জল-তোলা বায়ুচক্র আনিয়েছিলুম। প্রত্যাশা করেছিলুম প্রকাণ্ড এই যন্ত্রটার ঘূর্ণিপাখার চালনা দেখতে ছেলেদের আগ্রহ হবে। কিন্তু দেখলুম অতি অল্প ছেলেই ওটার দিকে ভালো করে তাকালে। ওরা নিতান্তই আলগাভাবে ধরে নিলে ও একটা

জিনিস মাত্র। কেবল একজন নেপালী ছেলে ওটাকে মন দিয়ে দেখেছে। টিনের বাক্স কেটে সে ওর একটা নকলও বানিয়েছে। মানুষের প্রতি আমাদের ছেলেদের ঔৎসুক্য দুর্বল, গাছপালা পশুপাখির প্রতিও। স্রোতের শ্যাওলার মতো ওদের মন ভেসে বেড়ায়, চার দিকের জগতে কোনো কিছুকেই আঁকড়ে ধরে না।

নিরৌৎসুক্যই আন্তরিক নির্জীবতা। আজকের দিনে যে সব জাতি সমস্ত পৃথিবীর উপর প্রভাব



বিস্তার করেছে সমস্ত পৃথিবীর সব কিছুরই উপরে তাদের ঔৎসুক্যের অন্ত নেই। কেবলমাত্র নিজের দেশের মানুষ ও বস্তু সম্বন্ধে নয়, এমন দেশ নেই এমন কাল নেই এমন বিষয় নেই যার প্রতি তাদের মন ধাবিত না হচ্ছে। মন তাদের সর্বতোভাবে বেঁচে আছে—তাদের এই সজীব চিত্ত-শক্তি জয়ী হল সর্বজগতে।

পূর্বেই আভাস দিয়েছি আশ্রমের শিক্ষা পরিপূর্ণভাবে বেঁচে থাকবার শিক্ষা। মরা মন নিয়েও পড়া মুখস্থ করে পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর ঊর্ধ্বশিখরে ওঠা যায়; আমাদের দেশে প্রত্যহ তার পরিচয় পাই। তারাই আমাদের দেশের ভালো ছেলে যাদের মন গ্রন্থের পত্রচর, ছাপার অক্ষরে একান্ত আসক্ত, বাইরের প্রত্যক্ষ জগতের প্রতি যাদের চিত্ত-বিক্ষেপের কোনো আশঙ্কা নেই। এরা পদবী অধিকার করে, জগৎ অধিকার করে না। প্রথম থেকে আমার সংকল্প এই ছিল, আমার আশ্রমের ছেলেরা চারি দিকের জগতের অব্যবহিত সম্পর্কে উৎসুক হয়ে থাকবে— সন্ধান করবে, পরীক্ষা করবে, সংগ্রহ করবে। অর্থাৎ এখানে এমন-সকল শিক্ষক সমবেত হবেন যাঁদের দৃষ্টি বইয়ের সীমানা পেরিয়ে গেছে, যাঁরা চক্ষুষ্মান, যাঁরা সন্ধানী, যাঁরা বিশ্বকুতূহলী, যাঁদের আনন্দ প্রত্যক্ষ জ্ঞানে এবং সেই জ্ঞানের বিষয়-বিস্তারে, যাঁদের প্রেরণাশক্তি সহযোগীমণ্ডল সৃষ্টি করে তুলতে পারে।

সব শেষে বলব আমি যেটাকে সব চেয়ে বড়ো মনে করি এবং যেটা সব চেয়ে দুর্লভ। তাঁরাই শিক্ষক হবার উপযুক্ত যাঁরা ধৈর্যবান, ছেলেদের প্রতি স্নেহ যাঁদের স্বাভাবিক। শিক্ষকদের নিজের চরিত্র

সম্বন্ধে যথার্থ বিপদের কথা এই যে, যাদের সঙ্গে তাঁদের ব্যবহার, ক্ষমতায় তারা তাঁদের সমকক্ষ নয়। তাদের প্রতি সামান্য কারণে অসহিষ্ণু হওয়া এবং বিদ্রূপ করা অপমান করা শাস্তি দেওয়া অনায়াসেই সম্ভব। যাকে বিচার করা যায় তার যদি কোনোই শক্তি না থাকে তবে অবিচার করাই সহজ হয়ে ওঠে। ক্ষমতা ব্যবহার করবার স্বাভাবিক যোগ্যতা যাদের নেই অক্ষমের প্রতি অবিচার করতে কেবল যে তাদের বাধা থাকে না তা নয়, তাদের আনন্দ থাকে। ছেলেরা অবোধ হয়ে দুর্বল হয়ে মায়ের কোলে আসে, এইজন্যে তাদের রক্ষার প্রধান উপায় মায়ের মনে অপর্যাপ্ত স্নেহ। তৎসত্ত্বেও স্বাভাবিক অসহিষ্ণুতা ও শক্তির অভিমান স্নেহকে অতিক্রম করেও ছেলেদের 'পরে অন্যায় অত্যাচারে প্রবৃত্ত করে, ঘরে ঘরে তার প্রমাণ দেখা যায়। ছেলেদের মানুষ হবার পক্ষে এমন বাধা অল্পই আছে। ছেলেদের কঠিন দণ্ড ও চরম দণ্ড দেবার দৃষ্টান্ত দেখলে আমি শিক্ষকদেরই দায়ী করে থাকি। পাঠশালায় মূর্খতার জন্যে ছাত্রদের 'পরে যে নির্যাতন ঘটে তার বারো আনা অংশ গুরুমশায়ের নিজেরই প্রাপ্য। বিদ্যালয়ের কাজে আমি যখন নিজে ছিলুম তখন শিক্ষকের কঠোর বিচার থেকে

ছাত্রকে রক্ষা করা আমার দুঃসাধ্য সমস্যা ছিল। অপ্রিয়তা স্বীকার করে আমাকে এ কথা বোঝাতে হয়েছে, শিক্ষার কাজটাকে বলের দ্বারা সহজ করবার জন্যেই যে শিক্ষক আছেন তা নয়। আজ পর্যন্ত মনে আছে চরম শাসন থেকে এমন অনেক ছাত্রকে রক্ষা করেছি যার জন্যে অনুতাপ করতে হয় নি। রাষ্ট্রতন্ত্রেই কী আর শিক্ষাতন্ত্রেই কী, কঠোর শাসননীতি শাসয়িতারই অযোগ্যতার প্রমাণ।

প্র আষাঢ় ১৩৪৩



২

শিলাইদহে পদ্মাতীরে সাহিত্যচর্চা নিয়ে নিভৃতে বাস করতুম। একটা সৃষ্টির সংকল্প নিয়ে সেখান থেকে এলেম শান্তিনিকেতনের প্রান্তরে।

তখন আশ্রমের পরিধি ছিল ছোটো। তার দক্ষিণ সীমানায় দীর্ঘ সার-বাঁধা শালগাছ। মাধবী-লতা-বিতানে প্রবেশের দ্বার। পিছনে পূর্ব দিকে আমবাগান, পশ্চিম দিকে কোথাও-বা তাল, কোথাও-বা জাম, কোথাও-বা ঝাউ, ইতস্তত গুটিকয়েক নারকেল। উত্তরপশ্চিম প্রান্তে প্রাচীন দুটি ছাতিমের তলায় মার্বেল পাথরে বাঁধানো একটি নিরলংকৃত বেদী। তার সামনে গাছের আড়াল নেই, দিগন্ত পর্যন্ত অবারিত মাঠ, সে মাঠে তখনো চাষ পড়ে নি। উত্তর দিকে আমলকীবনের মধ্যে অতিথিদের জন্যে দোতলা কোঠা আর তারি সংলগ্ন রান্নাবাড়ি প্রাচীন কদমগাছের ছায়ায়। আর একটি

মাত্র পাকা বাড়ি ছিল একতলা, তারি মধ্যে ছিল পুরানো আমলের বাঁধানো তত্ত্ববোধিনী এবং আরো কিছু বইয়ের সংগ্রহ। এই বাড়িটিকেই পরে প্রশস্ত করে এবং এর উপরে আর একতলা চড়িয়ে বর্তমান গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে। আশ্রমের বাইরে দক্ষিণের দিকে বাঁধ তখন ছিল বিস্তৃত এবং জলে ভরা। তার উত্তরের উঁচু পাড়িতে বহুকালের দীর্ঘ তালশ্রেণী। আশ্রম থেকে দেখা যেত বিনা বাধায়। আশ্রমের পূর্ব সীমানায় বোলপুরের দিকে ছায়া-শূন্য রাঙামাটির রাস্তা গেছে চলে। সে রাস্তায় লোকচলাচল ছিল সামান্য। কেননা শহরে তখনো ভিড় জমে নি, বাড়ি ঘর সেখানে অল্পই। ধানের কল তখনো আকাশে মলিনতা ও আহার্যে রোগ বিস্তার করতে আরম্ভ করে নি। চারিদিকে বিরাজ করত বিপুল অবকাশ নীরব নিস্তব্ধ।

আশ্রমের রক্ষী ছিল বৃদ্ধ দ্বারী সর্দার, ঋজু দীর্ঘ প্রাণসার তার দেহ। হাতে তার লম্বা পাকা-বাঁশের লাঠি, প্রথম বয়সের দস্যুবৃত্তির শেষ নিদর্শন। মালী ছিল হরিশ, দ্বারীর ছেলে। অতিথিভবনের একতলায় থাকতেন দ্বিপেন্দ্রনাথ তাঁর কয়েকজন অনুচর-পরিচর নিয়ে। আমি সস্ত্রীক আশ্রয় নিয়েছিলুম দোতলার ঘরে।

এই শান্ত জনবিরল শালবাগানে অল্প কয়েকটি ছেলে নিয়ে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সহায়তায় বিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ করেছিলুম। আমার পড়াবার জায়গা ছিল প্রাচীন জামগাছের তলায়।

ছেলেদের কাছে বেতন নেওয়া হত না, তাদের যা কিছু প্রয়োজন সমস্ত আমিই জুগিয়েছি। একটা কথা ভুলেছিলুম যে সেকালে রাজস্বের ষষ্ঠ ভাগের বরাদ্দ ছিল তপোবনে, আর আধুনিক চতুষ্পাঠীর অবলম্বন সামাজিক ক্রিয়াকর্ম উপলক্ষে নিত্য-প্রবাহিত দানদক্ষিণা। অর্থাৎ এগুলি সমাজেরই অঙ্গ, এদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে কোনো ব্যক্তিগত স্বতন্ত্র চেষ্টার প্রয়োজন ছিল না। অথচ আমার আশ্রম ছিল একমাত্র আমারি ক্ষীণ শক্তির উপরে নির্ভর করে। গুরুশিষ্যের মধ্যে আর্থিক দেনা-পাওনার সম্বন্ধ থাকা উচিত নয় এই মত একদা সত্য হয়েছিল যে সহজ উপায়ে, বর্তমান সমাজে সেটা প্রচলিত না থাকা সত্ত্বেও মতটাকে রক্ষা করবার চেষ্টা করতে গেলে কর্মকর্তার আত্মরক্ষা অসাধ্য হয়ে ওঠে, এই কথাটা অনেকদিন পর্যন্ত বহু দুঃখে আমার দ্বারা পরীক্ষিত হয়েছে। আমার সুযোগ হয়েছিল এই যে, ব্রহ্মবান্ধব এবং তাঁর খৃস্টান শিষ্য রেবাচাঁদ ছিলেন সন্ন্যাসী। এই কারণে

অধ্যাপনার আর্থিক ও কর্ম -ভার লঘ্ন হয়েছিল তাঁদের দ্বারা। এই প্রসঙ্গে আর একজনের কথা সর্বাপেক্ষা আমার মনে জাগছে, তাঁর কথা কোনোদিন ভুলতে পারি নে। গোড়া থেকে বলা যাক।

এই সময়ে দ্নটি তরুণ য্নবক, তাঁদের বালক বললেই হয়, এসে পড়লেন আমার কাছে। অজিতকুমার চক্রবর্তী তাঁর বন্ধ্ন কবি সতীশচন্দ্র রায়কে নিয়ে এলেন আমাদের জোড়াসাঁকো বাড়িতে,



আমার একতলার বসবার ঘরে। সতীশের বয়স তখন উনিশ, বি.এ. পরীক্ষা তাঁর আসন্ন। তাঁর প্নর্বে তাঁর একটি কবিতার খাতা অজিত আমাকে পড়বার জন্যে দিয়েছিলেন। পাতায় পাতায় খোলসা করেই জানাতে হয়েছে আমার মত। সব কথা অন্নকূল ছিল না। আর কেউ হলে এমন বিস্তারিত বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হতুম না। সতীশের লেখা পড়ে

বুঝেছিলুম তাঁর অল্প বয়সের রচনায় অসামান্যতা অনুজ্জ্বলভাবে প্রচ্ছন্ন। যাঁর ক্ষমতা নিঃসন্দিগ্ধ, দুটো একটা মিষ্ট কথায় তাঁকে বিদায় করা তাঁর অসম্মাননা। আমার মতের যে অংশ ছিল অপ্রিয় অজিত তাতে অসহিষ্ণু হয়েছিলেন, কিন্তু সৌম্য-মূর্তি সতীশ স্বীকার করে নিয়েছিলেন প্রসন্নভাবে।

আমার মনের মধ্যে তখন আশ্রমের সংকল্পটা সব সময়েই ছিল মুখর হয়ে। কথাপ্রসঙ্গে তার একটা ভবিষ্যৎ ছবি আমি এঁদের সামনে উৎসাহের সঙ্গে উজ্জ্বল করে ধরেছিলুম। দীপ্তি দেখা দিল সতীশের মুখে। আমি তাঁকে আহ্বান করি নি আমার কাজে। আমি জানতুম তাঁর সামনে তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপরের দুই বড়ো ধাপ বাকি। তার শেষভাগে ছিল জীবিকার আশ্বাসবাণী আইন পরীক্ষায়।

একদিন সতীশ এসে বললেন, যদি আমাকে গ্রহণ করেন আমি যোগ দিতে চাই আপনার কাজে। আমি বললুম, পরীক্ষা দিয়ে পরে চিন্তা কোরো। সতীশ বললেন, দেব না পরীক্ষা। কারণ, পরীক্ষা দিলেই আত্মীয়স্বজনের ধাক্কায় সংসারযাত্রার ঢালু পথে আমাকে গড়িয়ে নিয়ে চলবে।

কিছুতে তাঁকে নিরস্ত করতে পারলে না।

দারিদ্র্যের ভার অবহেলায় মাথায় করে নিয়ে যোগ দিলেন আশ্রমের কাজে। বেতন অস্বীকার করলেন। আমি তাঁর অগোচরে তাঁর পিতার কাছে যথাসাধ্য মাসিক বৃত্তি পাঠিয়ে দিতুম। তাঁর পরনে ছিল না জামা, একটা চাদর ছিল গায়ে, তার পরিধেয়তা জীর্ণ। যে ভাবরাজ্যে তিনি সঞ্চরণ করতেন সেখানে তাঁর জীবন পূর্ণ হত প্রতিক্ষণে প্রকৃতির রসভাণ্ডার থেকে। আত্মভোলা মানুষ, যখন তখন ঘুরে বেড়াতেন যেখানে সেখানে। প্রায় তার সঙ্গে থাকত ছেলেরা, চলতে চলতে তাঁর সাহিত্যসম্ভোগের আস্বাদন পেত তারাও। সেই অল্প বয়সে ইংরেজি সাহিত্যে সুগভীর অভিনিবেশ তাঁর মতো আর কারও মধ্যে পাই নি। যে সব ছাত্রকে পড়াবার ভার ছিল তাঁর 'পরে তারা ছিল নিতান্তই অর্বাচীন। ইংরেজি ভাষার সোপানশ্রেণীর সব নীচেকার পইঠা পার করে দেওয়াই ছিল তাঁর কাজ, কিন্তু কেজো সীমার মধ্যে বদ্ধ সংকীর্ণ নৈপুণ্য ছিল না তাঁর মাস্টারিতে। সাহিত্যের তিনি রসজ্ঞ সাধক ছিলেন, সেইজন্যে তিনি যা পাঠ দিতেন তা জমা করবার নয়, তা হজম করবার, তা হয়ে উঠত ছেলেদের মনের খাদ্য। তিনি দিতেন তাদের মনকে অবগাহন-স্নান, তার গভীরতা অত্যাবশ্যকের চেয়ে অনেক বেশি।

ভাষাশিক্ষার মধ্যে একটা অনিবার্য শাসন থাকে, সেই শাসনকে অতিক্রম করে দিতে পারতেন সাহিত্যের উদার মুক্তি। এক বৎসরের মধ্যে হল তাঁর মৃত্যু। তার বেদনা আজও রয়ে গেছে আমার মনে। আশ্রমে যারা শিক্ষক হবে তারা মুখ্যত হবে সাধক, আমার এই কল্পনাটি সম্পূর্ণ সত্য করেছিলেন সতীশ।

তার পরের পর্বে এসেছিলেন জগদানন্দ। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল সাধনা পত্রে তাঁর



প্রেরিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পড়ে। এই সকল প্রবন্ধের প্রাঞ্জল ভাষা ও সহজ বক্তব্যপ্রণালী দেখে তাঁর প্রতি আমার বিশেষ শ্রদ্ধা আকৃষ্ট হয়েছিল। তাঁর সাংসারিক অভাব মোচনের জন্য আমি তাঁকে প্রথমে আমাদের জমিদারির কাজে নিযুক্ত করেছিলেম। তার প্রধান কারণ জমিদারি দপ্তরে বেতনের কৃপণতা ছিল না। কিন্তু তাঁকে এই অযোগ্য আসনে বন্দী করে রাখতে আমার মনে বেদনা দিতে লাগল। আমি

তাঁকে শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনার কাজে আমন্ত্রণ করলুম। যদিও এই কার্যে আয়ের পরিমাণ অল্প ছিল তবুও আনন্দের পরিমাণ তাঁর পক্ষে ছিল প্রচুর। তার কারণ শিক্ষাদানে তাঁর স্বভাবের ছিল অকৃত্রিম তৃপ্তি। ছাত্রদের কাছে সর্বতোভাবে আত্মদানে তাঁর একটুও কৃপণতা ছিল না। সুগভীর করুণা ছিল বালকদের প্রতি। শাস্তি উপলক্ষেও তাদের প্রতি লেশমাত্র নির্মমতা তিনি সহ্য করতে পারতেন না। একজন ছাত্রকে কোনো শিক্ষক তার একবেলার আহার বন্ধ করে দণ্ডবিধান করেছিলেন। এই শাসনবিধির নিষ্ঠুরতায় তাঁকে অশ্রু বর্ষণ করতে দেখেছি। তাঁর বিজ্ঞানের ভাণ্ডার খোলা ছিল ছাত্রদের সম্মুখে যদিও তা তাদের পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্গত ছিল না। এই আত্মদানের অকার্পণ্য যথার্থ শিক্ষকের যথার্থ পরিচয়। তিনি আপনার আসনকে কখনো ছাত্রদের কাছ থেকে দূরে রাখেন নি। আত্মমর্যাদার স্বাতন্ত্র্য রক্ষার চেষ্টায় তিনি ছাত্রদের সেবায় কখনো লাইন টেনে চলতেন না। তাঁর অধ্যাপকের উচ্চ অধিকার তাঁর সদয় ব্যবহারের আবরণে কখনো অতিপ্রত্যক্ষ ছিল না। বস্তুত সকল বিষয়েই তিনি ছেলেদের সখা ছিলেন। তাঁর ক্লাসে গণিতশিক্ষায় কোনো ছাত্র কিছুমাত্র পিছিয়ে

পড়ে পরীক্ষায় যদি অকৃতার্থ হত সে তাঁকে অত্যন্ত আঘাত করত। শিক্ষার উচ্চ আদর্শ রক্ষার জন্য তাঁর অক্লান্ত চেষ্টা ছিল। অমনোযোগী বালকদের প্রতি তাঁর তর্জন গর্জন শুনতে অতিশয় ভয়জনক ছিল কিন্তু তাঁর স্নেহ তাঁর ভর্ৎসনাকে ভিতরে ভিতরে প্রতিবাদ করে চলত, ছাত্ররা তা প্রত্যহ অনুভব করেছে। যে শিক্ষকেরা আশ্রমের সৃষ্টিকার্যে আপনাকে সর্বতোভাবে উৎসর্গ করেছিলেন, জগদানন্দ তার মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন। তাঁর অভাব ও বেদনা আশ্রম কদাচ ভুলতে পারবে না।

সতীশের বন্ধু অজিতকুমার যথার্থ শিক্ষকের পদে উচ্চ স্থান অধিকার করেছিলেন। তাঁর বিদ্যা ছিল ইংরেজি সাহিত্যে ও দর্শনে বহুব্যাপ্ত। এই জ্ঞানের রাজ্যে তিনি ছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের ছাত্র। তিনিও নির্বিচারে ছাত্রদের কাছে তাঁর জ্ঞানের সঞ্চয় উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। তাঁর ছাত্রেরা সর্বদাই তাঁর শিক্ষকতা থেকে উচ্চ অঙ্গের সাহিত্যরস আস্বাদনের অবকাশ পেয়েছিল। যদিও তাদের বয়স অল্প ও যোগ্যতার সীমা সংকীর্ণ তবুও তিনি কখনো তাদের কাছ থেকে নিজের পদের অভিমানে নির্লিপ্ত ছিলেন না। সতীশের মতো দারিদ্র্যে তাঁর ঔদাসীন্য ছিল না তবুও

তিনি তা স্বীকার করে নিয়েছিলেন। আমাদের আশ্রম-নির্মাণ-কার্যে ইনি একজন নিপুণ স্থপতি ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই।

মাঝখানে অতি অল্প সময়ের জন্য এসেছিলেন আমার এক আত্মোৎসর্গপরায়ণ বন্ধু মোহিতচন্দ্র সেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ বিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সেখানকার খ্যাতি প্রতিপত্তি সমস্ত ত্যাগ করে যোগ দিয়েছিলেন শিক্ষার এমন নিম্ন স্তরে লোকখ্যাতির দিক থেকে যা তাঁর যোগ্য ছিল না। কিন্তু তাতেই তিনি প্রভূত আনন্দ পেয়েছিলেন। কারণ শিক্ষকতা ছিল তাঁর স্বভাব-সংগত। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়ে শিক্ষাব্রত অকালে সমাপ্ত হয়ে গেল। তাঁর অকৃপণতা ছিল আর্থিক দিকে এবং পারমার্থিক দিকে। প্রথম যেদিন আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল সেদিন তিনি আশ্রমের আদর্শের সম্বন্ধে যে সম্মান প্রকাশ করেছিলেন আমার আনন্দের পক্ষে তাই যথেষ্ট ছিল। অবশেষে বিদায় নেবার সময়ে তিনি বললেন, যদি আমি আপনার এখানকার কাজে

যোগদান করতে পারতুম তবে নিজেকে কৃতার্থ বোধ করতুম। কিন্তু সম্প্রতি তা সম্ভব না হওয়াতে কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধার অঞ্জলি দান করে গেলুম। এই বলে আমার হাতে একটি কাগজের মোড়ক দিয়ে গেলেন। পরে খুলে দেখলেম হাজার টাকার একখানি নোট। পরীক্ষকরূপে যা পেয়েছিলেন সমস্তই তিনি তাঁর শ্রদ্ধার নিদর্শনরূপে দান করে গেলেন। কিন্তু কেবল সেই একদিনের দান নয়, তার পর থেকে প্রতিদিন তিনি নিবেদন করেছেন তাঁর শ্রদ্ধার অর্ঘ্য একান্ত অনুপযুক্ত বেতন রূপে।

এঁদের অনেক পরে আশ্রমের সাধনাক্ষেত্রে দেখা দিলেন নন্দলাল। ছোটো বড়ো সমস্ত ছাত্রের সঙ্গে এই প্রতিভাসম্পন্ন আর্টিস্টের একাত্মকতা অতি আশ্চর্য। তাঁর আত্মদান কেবলমাত্র শিক্ষকতায় নয়, সর্বপ্রকার বদান্যতায়। ছাত্রদের রোগে, শোকে, অভাবে তিনি তাদের অকৃত্রিম বন্ধু। তাঁকে যারা শিল্পশিক্ষা উপলক্ষে কাছে পেয়েছে তারা ধন্য হয়েছে।

তার পর থেকে নানা কর্মী, নানা বন্ধু আশ্রমের সাধনাক্ষেত্রে সমবেত হয়েছেন এবং আপন আপন শক্তি ও স্বভাবের বিশিষ্টতা অনুসারে আশ্রমের গঠনকার্যে ক্রমশ বিচিত্র উপকরণ জুগিয়ে এসেছেন।

সৃষ্টিকার্যে এই বৈচিত্র্যের প্রয়োজন আছে। নতুন নতুন কালের প্রেরণায় নতুন নতুন রূপ আপনাকে ব্যক্ত করতে থাকে এবং এই উপায়েই কালের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে তবে সে আপনার শক্তিকে অক্ষুণ্ন রাখতে সমর্থ হয়। সেই পরিবর্তমান আদর্শের অনুবৃত্তির দ্বারা পুরাতন কালের ভিত্তির উপরেই নতুন কালের সৃষ্টি সম্পূর্ণতা লাভ করে। এই নিয়ে কোনো আক্ষেপ করা বৃথা। বস্তুত প্রাচীনকালের ছন্দে নতুনকাল তাল ভঙ্গ করলে সৃষ্টির সংগতি রক্ষা হয় না।



৩

'জীবনস্মৃতি'তে লিখেছি, আমার বয়স যখন অল্প ছিল তখনকার স্কুলের রীতিপ্রকৃতি এবং শিক্ষক ও ছাত্রদের আচরণ আমার পক্ষে নিতান্ত দুঃসহ হয়ে উঠেছিল। তখনকার শিক্ষাবিধির মধ্যে কোনো রস ছিল না, কিন্তু সেইটেই আমার অসহিষ্ণুতার একমাত্র কারণ নয়। কলকাতা শহরে আমি প্রায় বন্দী অবস্থায় ছিলেম। কিন্তু বাড়িতে তবুও বন্ধনের ফাঁকে ফাঁকে বাইরের প্রকৃতির সঙ্গে আমার একটা আনন্দের সম্বন্ধ জন্মে গিয়েছিল। বাড়ির দক্ষিণ দিকের পুকুরের জলে সকাল-সন্ধ্যার ছায়া এপার-ওপার করত—হাঁসগুলো দিত সাঁতার, গুগলি তুলত জলে ডুব দিয়ে, আষাঢ়ের জলে-ভরা নীলবর্ণ পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ সারবাঁধা নারকেলগাছের মাথার উপরে ঘনিয়ে আনত বর্ষার গম্ভীর সমারোহ। দক্ষিণের দিকে যে বাগানটা ছিল ঐখানেই নানা

রঙে ঋতুর পরে ঋতুর আমন্ত্রণ আসত উৎসুক দৃষ্টির পথে আমার হৃদয়ের মধ্যে।

শিশুর জীবনের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির এই যে আদিম কালের যোগ, প্রাণমনের বিকাশের পক্ষে এর যে কত বড়ো মূল্য তা আশা করি ঘোরতর শাহরিক লোককেও বোঝাবার দরকার নেই। ইস্কুল যখন নীরস পাঠ্য, কঠোর শাসনবিধি ও প্রভুত্বপ্রিয় শিক্ষকদের নির্বিচার অন্যায় নির্মমতায় বিশ্বের সঙ্গে বালকের সেই মিলনের বৈচিত্র্যকে চাপা দিয়ে তার দিনগুলিকে নির্জীব নিরালোক নিষ্ঠুর করে তুলেছিল তখন প্রতিকারহীন বেদনায় মনের মধ্যে ব্যর্থ বিদ্রোহ উঠেছিল একান্ত চঞ্চল হয়ে। যখন আমার বয়স তেরো তখন এডুকেশন-বিভাগীয় দাঁড়ের শিকল ছিন্ন করে বেরিয়ে পড়েছিলেম। তার পর থেকে যে বিদ্যালয়ে হলেম ভর্তি তাকে যথার্থই বলা যায় বিশ্ববিদ্যালয়। সেখানে আমার ছুটি ছিল না, কেননা অবিশ্রাম কাজের মধ্যেই পেয়েছি ছুটি। কোনো কোনো দিন পড়েছি রাত দুটো পর্যন্ত। তখনকার অপ্রখর আলোকের যুগে রাত্রে সমস্ত পাড়া নিস্তব্ধ, মাঝে মাঝে শোনা যেত 'হরিবোল' শ্মশানযাত্রীদের কণ্ঠ থেকে। ভেরেণ্ডা তেলের সেজের প্রদীপে দুটো সলতের মধ্যে একটা সলতে

নিবিয়ে দিতুম, তাতে শিখার তেজ হ্রাস হত কিন্তু হত আয়ুবৃদ্ধি। মাঝে মাঝে অন্তঃপুর থেকে বড়-দিদি এসে জোর করে আমার বই কেড়ে নিয়ে আমাকে পাঠিয়ে দিতেন বিছানায়। তখন আমি যে সব বই পড়বার চেষ্টা করেছি কোনো কোনো গুরুজন তা আমার হাতে দেখে মনে করেছেন স্পর্ধা। শিক্ষার কারাগার থেকে বেরিয়ে এসে যখন শিক্ষার স্বাধীনতা পেলুম তখন কাজ বেড়ে গেল অনেক বেশি অথচ ভার গেল কমে।

তার পরে সংসারে প্রবেশ করলেম; রথীন্দ্রনাথকে পড়াবার সমস্যা এল সামনে। তখন প্রচলিত প্রথায় তাকে ইস্কুলে পাঠালে আমার দায় হত লঘু এবং আত্মীয়বান্ধবেরা সেইটেই প্রত্যাশা করেছিলেন। কিন্তু বিশ্বক্ষেত্র থেকে যে শিক্ষালয় বিচ্ছিন্ন সেখানে তাকে পাঠানো আমার পক্ষে ছিল অসম্ভব। আমার ধারণা ছিল, অন্তত জীবনের আরম্ভকালে নগরবাস প্রাণের পুষ্টি ও মনের প্রথম বিকাশের পক্ষে অনুকূল নয়। বিশ্বপ্রকৃতির অনুপ্রেরণা থেকে বিচ্ছেদ তার একমাত্র কারণ নয়। শহরে যানবাহন ও প্রাণযাত্রার অন্যান্য নানাবিধ সুযোগ থাকে, তাতে সম্পূর্ণ দেহচালনা ও চারিদিকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভে শিশুরা বঞ্চিত হয়; বাহ্য বিষয়ে আত্মনির্ভর

চিরদিনের মতো তাদের শিথিল হয়ে যায়। প্রশ্রয়-প্রাপ্ত যে সব বাগানের গাছ উপর থেকেই জল-সেচনের সুযোগ পায় তারা উপরে উপরেই মাটির সঙ্গে সংলগ্ন থাকে, গভীর ভূমিতে শিকড় চালিয়ে দিয়ে স্বাধীনজীবী হবার শিক্ষা তাদের হয় না; মানুষের পক্ষেও সেইরকম। দেহটাকে সম্যক্‌রূপে ব্যবহার করবার যে শিক্ষা প্রকৃতি আমাদের কাছে দাবি করে এবং নাগরিক 'ভদ্দর' শ্রেণীর রীতির কাছে যেটা উপেক্ষিত অবজ্ঞাভাজন তার অভাব-দুঃখ আমার জীবনে আজ পর্যন্ত আমি অনুভব করি। তাই সে সময়ে আমি কলকাতা শহর প্রায় বর্জন করেছিলেম। তখন সপরিজনে থাকতেম শিলাইদহে। সেখানে আমাদের জীবনযাপনের পদ্ধতি ছিল নিতান্তই সাদাসিধে। সেটা সম্ভব হয়েছিল তার কারণ, যে সমাজে আমরা মানুষ সে সমাজে প্রচলিত প্রাণযাত্রার রীতি ও আদর্শ এখানে পৌঁছতে পারত না, এমনকি তখনকার দিনে নগরবাসী মধ্যবিত্ত লোকেরাও যে সকল আরামে ও আড়ম্বরে অভ্যস্ত তাও ছিল আমাদের থেকে বহু দূরে। বড়ো শহরে পরস্পরের অনুকরণে ও প্রতিযোগিতায় যে অভ্যাস-গুলি অপরিহার্যরূপে গড়ে ওঠে সেখানে তার সম্ভাবনা মাত্র ছিল না।

শিলাইদহে বিশ্বপ্রকৃতির নিকটসান্নিধ্যে রথীন্দ্রনাথ যেরকম ছাড়া পেয়েছিল সেরকম মুক্তি তখনকার কালের সম্পন্ন অবস্থার গৃহস্থেরা আপন ঘরের ছেলেদের পক্ষে অনুপযোগী বলেই জানত এবং তার মধ্যে যে বিপদের আশঙ্কা আছে তারা ভয় করত তা স্বীকার করতে। রথী সেই বয়সে ডিঙি বেয়েছে নদীতে। সেই ডিঙিতে করে চলতি স্টীমার থেকে সে প্রতিদিন রুটি নামিয়ে আনত; তাই নিয়ে স্টীমারের সারঙ আপত্তি করেছে বার বার। চরে বনঝাউয়ের জঙ্গলে সে বেরোত শিকার করতে—কোনোদিন বা ফিরে এসেছে সমস্ত দিন পরে অপরাহ্ণে। তা নিয়ে ঘরে উদ্‌বেগ ছিল না তা বলতে পারি নে, কিন্তু সে উদ্‌বেগ থেকে নিজেদের বাঁচাবার জন্যে বালকের স্বাধীন সঞ্চরণ খর্ব করা হয় নি। যখন রথীর বয়স ছিল ষোলোর নীচে তখন আমি তাকে কয়েক জন তীর্থযাত্রীর সঙ্গে পদব্রজে কেদারনাথ-ভ্রমণে পাঠিয়েছি, তা নিয়ে ভর্ৎসনা স্বীকার করেছি আত্মীয়দের কাছ থেকে, কিন্তু একদিকে প্রকৃতির ক্ষেত্রে অন্যদিকে সাধারণ দেশবাসীদের সম্বন্ধে যে কষ্টসহিষ্ণু অভিজ্ঞতা আমি তার শিক্ষার অত্যাবশ্যক অঙ্গ বলে জানতুম তার থেকে তাকে স্নেহের ভীরুতাবশত বঞ্চিত করি নি।

শিলাইদহে কুঠিবাড়ির চারদিকে যে জমি ছিল প্রজাদের মধ্যে নতুন ফসল প্রচারের উদ্দেশ্যে সেখানে নানা পরীক্ষায় লেগেছিলেম। এই পরীক্ষাব্যাপারে সরকারি কৃষিবিভাগের বিশেষজ্ঞদের সহায়তা অত্যধিক পরিমাণেই মিলেছিল। তাঁদের আদিষ্ট উপাদানের তালিকা দেখে চিচেস্‌টরে যারা এগ্রিকাল-চারাল্‌ কলেজে পাশ করে নি এমন-সব চাষিরা



হেসেছিল; তাদেরই হাসিটা টিঁকেছিল শেষ পর্যন্ত। মরার লক্ষণ আসন্ন হলেও শ্রদ্ধাবান রোগীরা যেমন করে চিকিৎসকের সমস্ত উপদেশ অক্ষুণ্ণ রেখে পালন করে, পঞ্চাশ বিঘে জমিতে আলু চাষের পরীক্ষায় সরকারি কৃষিতত্ত্বপ্রবীণদের নির্দেশ সেইরকম একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গেই পালন করেছি। তাঁরাও আমার ভরসা জাগিয়ে রাখবার জন্যে

পরিদর্শনকার্যে সর্বদাই যাতায়াত করেছেন। তারই বহুব্যয়সাধ্য ব্যর্থতার প্রহসন নিয়ে বন্ধুবর জগদীশচন্দ্র আজও প্রায় মাঝে মাঝে হেসে থাকেন। কিন্তু তাঁরও চেয়ে প্রবল অট্টহাস্য নীরবে ধ্বনিত হয়েছিল চামরু-নাম-ধারী এক-হাত-কাটা সেই রাজবংশী চাষির ঘরে, যে ব্যক্তি পাঁচ কাঠা জমির উপযুক্ত বীজ নিয়ে কৃষিতত্ত্ববিদের সকল উপদেশই অগ্রাহ্য করে আমার চেয়ে প্রচুরতর ফল লাভ করেছিল। চাষবাস-সম্বন্ধীয় যে সব পরীক্ষা-ব্যাপারের মধ্যে বালক বেড়ে উঠেছিল তারই একটা নমুনা দেবার জন্যে এই গল্পটা বলা গেল; পাঠকেরা হাসতে চান হাসুন, কিন্তু এ কথা যেন মানেন যে শিক্ষার অঙ্গরূপে এই ব্যর্থতাও ব্যর্থ নয়। এত বড়ো অদ্ভুত অপব্যয়ে আমি যে প্রবৃত্ত হয়েছিলুম তার কুইক্‌সটিত্বের মূল্য চামরুকে বোঝাবার সুযোগ হয় নি, সে এখন পরলোকে।

এরই সঙ্গে সঙ্গে পুঁথিগত বিদ্যার আয়োজন ছিল সে কথা বলা বাহুল্য। এক পাগলা মেজাজের চালচুলোহীন ইংরেজ শিক্ষক হঠাৎ গেল জুটে। তার পড়াবার কায়দা খুবই ভালো, আরো ভালো এই যে কাজে ফাঁকি দেওয়া তার ধাতে ছিল না। মাঝে মাঝে মদ খাবার দুর্নিবার উত্তেজনায় সে

পালিয়ে গেছে কলকাতায়, তার পর মাথা হেঁট করে ফিরে এসেছে লজ্জিত অনুতপ্ত চিত্তে। কিন্তু কোনোদিন শিলাইদহে মত্ততায় আত্মবিস্মৃত হয়ে ছাত্রদের কাছে শ্রদ্ধা হারাবার কোনো কারণ ঘটায় নি। ভৃত্যদের ভাষা বুঝতে পারত না, সেটাকে অনেক সময়ে সে মনে করেছে ভৃত্যদেরই অসৌজন্য। তা ছাড়া সে আমার প্রাচীন মুসলমান চাকরকে তার পিতৃদত্ত ফটিক নামে কোনোমতেই ডাকত না। তাকে অকারণে সম্বোধন করত সুলেমান। এর মনস্তত্ত্বরহস্য কী জানি নে। এতে বার বার অসুবিধা ঘটত। কারণ চাষিঘরের সেই চাকরটি বরাবরই ভুলত তার অপরিচিত নামের মর্যাদা।

আরো কিছু বলবার কথা আছে। লরেন্সকে পেয়ে বসল রেশমের চাষের নেশায়। শিলাইদহের নিকটবর্তী কুমারখালি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে রেশম-ব্যবসায়ের একটা প্রধান আড্ডা ছিল। সেখানকার রেশমের বিশিষ্টতা খ্যাতিলাভ করেছিল বিদেশী হাটে। সেখানে ছিল রেশমের মস্ত বড়ো কুঠি। একদা রেশমের তাঁত বন্ধ হল সমস্ত বাংলা দেশে, পূর্বস্মৃতির স্বপ্নাবিষ্ট হয়ে কুঠি রইল শূন্য পড়ে। যখন পিতৃঋণের প্রকাণ্ড বোঝা আমার পিতার সংসার চেপে ধরল বোধ করি তারই কোনো

এক সময়ে তিনি রেলওয়ে কোম্পানিকে এই কুঠি বিক্রি করেন। সে সময়ে গোরাই নদীর উপরে ব্রিজ তৈরি হচ্ছে। এই সেকেলে প্রাসাদের প্রভূত ইঁট পাথর ভেঙে নিয়ে সেই কোম্পানি নদীর বেগ ঠেকাবার কাজে সেগুলো জলাঞ্জলি দিলে। কিন্তু যেমন বাংলার তাঁতির দুর্দিনকে কেউ ঠেকাতে পারলে না, যেমন সাংসারিক দুর্যোগে পিতামহের বিপুল ঐশ্বর্যের ধ্বংস কিছুতে ঠেকানো গেল না —তেমনি কুঠিবাড়ির ভগ্নাবশেষ নিয়ে নদীর ভাঙন রোধ মানলে না; সমস্তই গেল ভেসে; সুসময়ের চিহ্নগুলোকে কালস্রোত যেটুকু রেখেছিল নদীর স্রোতে তাকে দিলে ভাসিয়ে।

লরেন্সের কানে গেল রেশমের সেই ইতিবৃত্ত। ওর মনে লাগল, আর একবার সেই চেষ্টার প্রবর্তন করলে ফল পাওয়া যেতে পারে; দুর্গতি যদি খুব বেশি হয় অন্তত আলুর চাষকে ছাড়িয়ে যাবে না। চিঠি লিখে যথারীতি বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে সে খবর আনালে। কীটদের আহার জোগাবার জন্যে প্রয়োজন ভেরেণ্ডা গাছের। তাড়াতাড়ি জন্মানো গেল কিছু গাছ কিন্তু লরেন্সের সবুর সইল না। রাজশাহি থেকে গুটি আনিয়ে পালনে প্রবৃত্ত হল অচিরাৎ। প্রথমত বিশেষজ্ঞদের কথাকে বেদবাক্য

বলে মানলে না, নিজের মতে নতুন পরীক্ষা করতে করতে চলল। কীটগুলোর ক্ষুদে ক্ষুদে মুখ, ক্ষুদে ক্ষুদে গ্রাস, কিন্তু ক্ষুধার অবসান নেই। তাদের বংশবৃদ্ধি হতে লাগল খাদ্যের পরিমিত আয়োজনকে লঙ্ঘন করে। গাড়ি করে দূর দূর থেকে অনবরত পাতার জোগান চলল। লরেন্সের বিছানাপত্র, তার চৌকি টেবিল, খাতা বই, তার টুপি পকেট কোর্তা—সর্বত্রই হল গুটির জনতা। তার ঘর দুর্গম হয়ে উঠল দুর্গন্ধের ঘন আবেষ্টনে। প্রচুর ব্যয় ও অক্লান্ত অধ্যবসায়ের পর মাল জমল বিস্তর, বিশেষজ্ঞেরা বললেন অতি উৎকৃষ্ট, এ জাতের রেশমের এমন সাদা রঙ হয় না। প্রত্যক্ষ দেখতে পাওয়া গেল সফলতার রূপ—কেবল একটুখানি ত্রুটি রয়ে গেল। লরেন্স বাজার যাচাই করে জানলে তখনকার দিনে এ মালের কাটতি অল্প, তার দাম সামান্য। বন্ধ হল ভেরেন্ডা পাতার অনবরত গাড়ি-চলাচল, অনেকদিন পড়ে রইল ছালাভরা গুটিগুলো; তার পরে তাদের কী ঘটল তার কোনো হিসেব আজ কোথাও নেই। সেদিন বাংলাদেশে এই গুটিগুলোর উৎপত্তি হল অসময়ে। কিন্তু যে শিক্ষালয় খুলেছিলেম তার সময় পালন তারা করেছিল।

আমাদের পণ্ডিত ছিলেন শিবধন বিদ্যার্ণব। বাংলা আর সংস্কৃত শেখানো ছিল তাঁর কাজ, আর তিনি ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থ থেকে উপনিষদের শ্লোক ব্যাখ্যা করে আবৃত্তি করাতেন। তাঁর বিশুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণে পিতৃদেব তাঁর প্রতি বিশেষ প্রসন্ন ছিলেন। বাল্যকাল থেকে প্রাচীন ভারতবর্ষের তপোবনের যে আদর্শ আমার মনে ছিল তার কাজ এমনি করে শুরু হয়েছিল কিন্তু তার মূর্তি সম্যক্ উপাদানে গড়ে ওঠে নি।

দীর্ঘকাল ধরে শিক্ষা সম্বন্ধে আমার মনের মধ্যে যে মতটি সক্রিয় ছিল মোটের উপর সেটি হচ্ছে এই যে, শিক্ষা হবে প্রতিদিনের জীবনযাত্রার নিকট অঙ্গ, চলবে তার সঙ্গে এক তালে এক সুরে, সেটা ক্লাসনামধারী খাঁচার জিনিস হবে না। আর যে বিশ্বপ্রকৃতি প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ ভাবে আমাদের দেহে মনে শিক্ষাবিস্তার করে সেও এর সঙ্গে হবে মিলিত। প্রকৃতির এই শিক্ষালয়ের একটা অঙ্গ পর্যবেক্ষণ আর একটা পরীক্ষা, এবং সকলের চেয়ে বড়ো তার কাজ প্রাণের মধ্যে আনন্দ-সঞ্চার। এই গেল বাহ্য প্রকৃতি। আর আছে দেশের অন্তঃপ্রকৃতি, তারও বিশেষ রস আছে, রঙ আছে, ধ্বনি আছে। ভারতবর্ষের চিরকালের যে চিত্ত

সেটার আশ্রয় সংস্কৃতভাষায়। এই ভাষার তীর্থ-পথ দিয়ে আমরা দেশের চিন্ময় প্রকৃতির স্পর্শ পাব, তাকে অন্তরে গ্রহণ করব, শিক্ষার এই লক্ষ্য মনে আমার দৃঢ় ছিল। ইংরেজি ভাষার ভিতর দিয়ে নানা জ্ঞাতব্য বিষয় আমরা জানতে পারি, সেগুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু সংস্কৃত ভাষার একটা আনন্দ আছে, সে রঞ্জিত করে আমাদের মনের আকাশকে; তার মধ্যে আছে একটি গভীর বাণী, বিশ্বপ্রকৃতির মতোই সে আমাদের শান্তি দেয় এবং চিন্তাকে মর্যাদা দিয়ে থাকে।



যে শিক্ষাতত্ত্বকে আমি শ্রদ্ধা করি তার ভূমিকা হল এইখানে। এতে যথেষ্ট সাহসের প্রয়োজন ছিল, কেননা এর পথ অনভ্যস্ত এবং চরম ফল অপরীক্ষিত। এই শিক্ষাকে শেষ পর্যন্ত চালনা করবার শক্তি আমার ছিল না, কিন্তু এর ’পরে নিষ্ঠা আমার অবিচলিত। এর সমর্থন ছিল না দেশের কোথাও। তার একটা প্রমাণ বলি। একদিকে

অরণ্যবাসে দেশের উন্মুক্ত বিশ্বপ্রকৃতি আর-এক দিকে গুরুগৃহবাসে দেশের শুদ্ধতম উচ্চতম সংস্কৃতি—এই উভয়ের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে তপোবনে একদা যে নিয়মে শিক্ষা চলত আমি কোনো-এক বক্তৃতায় তার প্রতি আমার শ্রদ্ধা ব্যাখ্যা করেছিলেম। বলেছিলেম, আধুনিক কালে শিক্ষার উপাদান অনেক বাড়াতে হবে সন্দেহ নেই, কিন্তু তার রূপটি তার রসটি তৈরি হয়ে উঠবে প্রকৃতির সহযোগে, এবং যিনি শিক্ষা দান করবেন তাঁর অন্তরঙ্গ আধ্যাত্মিক সংসর্গে। শুনে সেদিন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেছিলেন, এ কথাটি কবিজনোচিত, কবি এর অত্যাবশ্যকতা যতটা কল্পনা করেছেন আধুনিক কালে ততটা স্বীকার করা যায় না। আমি প্রত্যুত্তরে তাঁকে বলেছিলেম, বিশ্বপ্রকৃতি ক্লাসে ডেস্কের সামনে বসে মাস্টারি করেন না, কিন্তু জলে স্থলে আকাশে তাঁর ক্লাস খুলে আমাদের মনকে তিনি যে প্রবল শক্তিতে গড়ে তোলেন কোনো মাস্টার কি তা পারে। আরবের মানুষকে কি আরবের মরুভূমিই গড়ে তোলে নি—সেই মানুষই বিচিত্র ফুলশস্যশালিনী নীলনদীতীরবর্তী ভূমিতে যদি জন্ম নিত তা হলে কি তার প্রকৃতি অন্যরকম হত না। যে প্রকৃতি সজীব বিচিত্র, আর যে শহর নির্জীব পাথরে-বাঁধানো, চিত্ত-

গঠন সম্বন্ধে তাদের প্রভাবের প্রবল প্রভেদ নিঃসংশয়।

এ কথা নিশ্চিত জানি, যদি আমি বাল্যকাল থেকে অধিকাংশ সময়ই শহরে আবদ্ধ থাকতেম তবে তার প্রভাবটা প্রচুর পরিমাণেই প্রকাশ পেত আমার চিন্তায় আমার রচনায়। বিদ্যায় বুদ্ধিতে সেটা বিশেষভাবে অনুভব করা যেত কি না জানি নে, কিন্তু ধাত হত অন্যপ্রকারের। বিশ্বের অযাচিত দান থেকে যে পরিমাণে নিয়ত বঞ্চিত হতেম সেই পরিমাণে বিশ্বকে প্রতিদানের সম্পদে আমার স্বভাবে দারিদ্র্য থেকে যেত। এইরকম আন্তরিক জিনিসটার বাজার-দর নেই বলেই এর অভাব সম্বন্ধে যে মানুষ স্বচ্ছন্দে নিশ্চেতন থাকে সেরকম বেদনাহীন হতভাগ্য যে কৃপাপাত্র তা অন্তর্যামী জানেন। সংসারযাত্রায় সে যেমনি কৃতকৃত্য হোক, মানবজন্মের পূর্ণতায় সে চিরদিন থেকে যায় অকৃতার্থ।

সেইদিনই আমি প্রথম মনে করলেম, শুধু মুখের কথায় ফল হবে না; কেননা এ সব কথা এখনকার কালের অভ্যাসবিরুদ্ধ। এই চিন্তাটা কেবলই মনের মধ্যে আন্দোলিত হতে লাগল যে এই আদর্শকে যতটা পারি কর্মক্ষেত্রে রচনা করে তুলতে হবে। তপোবনের বাহ্য অনুকরণ যাকে বলা যেতে পারে তা

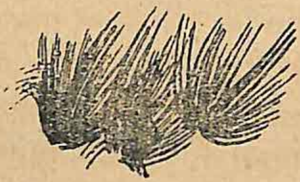
অগ্রাহ্য, কেননা এখনকার দিনে তা অসংগত, তা মিথ্যে। তার ভিতরকার সত্যটিকে আধুনিক জীবনযাত্রার আধারে প্রতিষ্ঠিত করা চাই।

তার কিছুকাল পূর্বে শান্তিনিকেতন আশ্রম পিতৃদেব জনসাধারণকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। বিশেষ নিয়ম পালন করে অতিথিরা যাতে দুই তিন দিন আধ্যাত্মিক শান্তির সাধনা করতে পারেন এই ছিল তাঁর সংকল্প। এজন্য উপাসনা-মন্দির লাইব্রেরি ও অন্যান্য ব্যবস্থা ছিল যথোচিত। কদাচিৎ সেই উদ্দেশ্যে কেউ কেউ এখানে আসতেন, কিন্তু অধিকাংশ লোক আসতেন ছুটি যাপন করবার সুযোগে এবং বায়ুপরিবর্তনের সাহায্যে শারীরিক আরোগ্যসাধনায়।

আমার বয়স যখন অল্প পিতৃদেবের সঙ্গে ভ্রমণে বের হয়েছিলেম। ঘর ছেড়ে সেই আমার প্রথম বাহিরে যাত্রা। ইঁটকাঠের অরণ্য থেকে অবারিত আকাশের মধ্যে বৃহৎ মুক্তি এই প্রথম আমি ভোগ করেছি। প্রথম বললে সম্পূর্ণ ঠিক বলা হয় না। এর পূর্বে কলকাতায় একবার যখন ডেঙ্গুজ্বর সংক্রামক হয়ে উঠেছিল তখন আমার গুরুজনদের সঙ্গে আশ্রয় নিয়েছিলেম গঙ্গার ধারে লালাবাবুদের বাগানে। বসুন্ধরার উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে সুদূরব্যাপ্ত

আস্তরণের একটি প্রান্তে সেদিন আমার বসবার আসন জুটেছিল। সমস্ত দিন বিরাটের মধ্যে মনকে ছাড়া দিয়ে আমার বিস্ময়ের এবং আনন্দের ক্লান্তি ছিল না। কিন্তু তখনো আমি আমাদের পূর্বনিয়মে ছিলেম বন্দী, অবাধে বেড়ানো ছিল নিষিদ্ধ। অর্থাৎ কলকাতায় ছিলেম ঢাকা খাঁচার পাখি, কেবল চলার স্বাধীনতা নয় চোখের স্বাধীনতাও ছিল সংকীর্ণ; এখানে রইলুম দাঁড়ের পাখি, আকাশ খোলা চারি দিকে কিন্তু পায়ে শিকল। শান্তিনিকেতনে এসেই আমার জীবনে প্রথম সম্পূর্ণ ছাড়া পেয়েছি বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে। উপনয়নের পরেই আমি এখানে এসেছি। উপনয়ন-অনুষ্ঠানে ভূর্ভুবঃস্বর্লোকের মধ্যে চেতনাকে পরিব্যাপ্ত করবার যে দীক্ষা পেয়েছিলেম পিতৃদেবের কাছ থেকে, এখানে বিশ্বদেবতার কাছ থেকে পেয়েছিলেম সেই দীক্ষাই। আমার জীবন নিতান্তই অসম্পূর্ণ থাকত প্রথম বয়সে এই সুযোগ যদি আমার না ঘটত। পিতৃদেব কোনো নিষেধ বা শাসন দিয়ে আমাকে বেষ্টন করেন নি। সকাল-বেলায় অল্প কিছুক্ষণ তাঁর কাছে ইংরেজি ও সংস্কৃত পড়তেম, তার পরে আমার অবাধ ছুটি। বোলপুর শহর তখন স্ফীত হয়ে ওঠে নি। চালের কলের ধোঁয়া আকাশকে কলুষিত আর তার দুর্গন্ধ সমল

করে নি মলয় বাতাসকে। মাঠের মাঝখান দিয়ে যে লাল মাটির পথ চলে গেছে তাতে লোক-চলাচল ছিল অল্পই। বাঁধের জল ছিল পরিপূর্ণ প্রসারিত, চার দিক থেকে পলি-পড়া চাষের জমি তাকে কোণ-ঠেসা করে আনে নি। তার পশ্চিমের উঁচু পাড়ির উপর অক্ষুণ্ণ ছিল ঘন তালগাছের শ্রেণী। যাকে আমরা খোয়াই বলি, অর্থাৎ কাঁকুরে জমির মধ্যে দিয়ে বর্ষার জলধারায় আঁকাবাঁকা উঁচুনিচু খোদাই পথ, সে ছিল



নানা জাতের নানা আকৃতির পাথরে পরিকীর্ণ; কোনোটাতে শির-কাটা পাতার ছাপ, কোনোটা লম্বা আঁশওয়ালা কাঠের টুকরোর মতো, কোনোটা স্ফটিকের দানা সাজানো, কোনোটা অগ্নিগলিত মসৃণ। মনে আছে ১৮৭০ খৃস্টাব্দের ফরাসি-প্রুশীয় যুদ্ধের পরে একজন ফরাসি সৈনিক আমাদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল; সে ফরাসি রান্না রেঁধে খাওয়াত আমার দাদাদের আর তাঁদের ফরাসি ভাষা শেখাত। তখন আমার দাদারা একবার

বোলপনুরে এসেছিলেন, সে ছিল সঙ্গে। একটা ছোটো হাতুড়ি নিয়ে আর একটা থলি কোমরে ঝনুলিয়ে সে এই খোয়াইয়ে দনুর্লভ পাথর সন্ধান করে বেড়াত। একদিন একটা বড়োগোছের স্ফটিক সে পেয়েছিল, সেটাকে আংটির মতো বাঁধিয়ে কলকাতার কোন্ ধনীর কাছে বেচেছিল আশি টাকায়। আমিও সমস্ত দনুপনুরবেলা খোয়াইয়ে প্রবেশ করে নানারকম পাথর সংগ্রহ করেছি, ধন উপার্জনের লোভে নয় পাথর উপার্জন করতেই। মাঠের জল চুঁইয়ে সেই খোয়াইয়ের এক জায়গায় উপরের ডাঙা থেকে ছোটো ঝরনা ঝরে পড়ত। সেখানে জমেছিল একটি ছোটো জলাশয়, তার সাদাটে ঘোলা জল আমার পক্ষে ডুব দিয়ে স্নান করবার মতো যথেষ্ট গভীর। সেই ডোবাটা উপচিয়ে ক্ষীণ স্বচ্ছ জলের স্রোত ঝির্ ঝির্ করে বয়ে যেত নানা শাখাপ্রশাখায়, ছোটো ছোটো মাছ সেই স্রোতে উজানমনুখে সাঁতার কাটত। আমি জলের ধার বেয়ে বেয়ে আবিষ্কার করতে বেরতুম সেই শিশনু-ভূবিভাগের নতুন নতুন বালখিল্য গিরিনদী। মাঝে মাঝে পাওয়া যেত পাড়ির গায়ে গহ্বর। তার মধ্যে নিজেকে প্রচ্ছন্ন করে অচেনা জিওগ্রাফির মধ্যে ভ্রমণকারীর গৌরব অননুভব করতুম। খোয়াইয়ের স্থানে

স্থানে যেখানে মাটি জমা সেখানে বেঁটে বেঁটে বুনো জাম বুনো খেজুর; কোথাও-বা ঘন কাশ লম্বা হয়ে উঠেছে। উপরে দূরমাঠে গোরু চরছে, সাঁওতালরা কোথাও করছে চাষ, কোথাও চলেছে পথহীন প্রান্তরে আর্তস্বরে গোরুর গাড়ি, কিন্তু এই খোয়াইয়ের গহ্বরে জনপ্রাণী নেই। ছায়ায় রৌদ্রে বিচিত্র লাল কাঁকরের এই নিভৃত জগৎ, না দেয় ফল, না দেয় ফুল, না উৎপন্ন করে ফসল; এখানে না আছে কোনো জীব-জন্তুর বাসা; এখানে কেবল দেখি কোনো আর্টিস্ট-বিধাতার বিনা কারণে একখানা যেমন-তেমন ছবি আঁকবার শখ; উপরে মেঘহীন নীল আকাশ রৌদ্রে পাণ্ডুর, আর নীচে লাল কাঁকরের রঙ পড়েছে মোটা তুলিতে নানারকমের বাঁকাচোরা বন্ধুর রেখায়, সৃষ্টিকর্তার ছেলেমানুষি ছাড়া এর মধ্যে আর কিছুই দেখা যায় না। বালকের খেলার সঙ্গেই এর রচনার ছন্দের মিল; এর পাহাড়, এর নদী, এর জলাশয়, এর গুহাগহ্বর সবই বালকের মনেরই পরিমাপে। এইখানে একলা আপন মনে আমার বেলা কেটেছে অনেকদিন, কেউ আমার কাজের হিসাব চায় নি, কারও কাছে আমার সময়ের জবাবদিহি ছিল না। এখন এ খোয়াইয়ের সে চেহারা নেই। বৎসরে বৎসরে রাস্তা-মেরামতের মশলা এর উপর থেকে

চে'চে নিয়ে একে নগ্ন দরিদ্র করে দিয়েছে, চলে গেছে এর বৈচিত্র্য, এর স্বাভাবিক লাবণ্য। তখন শান্তিনিকেতনে আর একটি রোমাণ্টিক অর্থাৎ কাহিনী-রসের জিনিস ছিল। যে সর্দার ছিল এই বাগানের প্রহরী এককালে সেই ছিল ডাকাতের দলের নায়ক। তখন সে বৃদ্ধ, দীর্ঘ তার দেহ, মাংসের বাহুল্য মাত্র নেই, শ্যামবর্ণ, তীক্ষ্ণ চোখের দৃষ্টি, লম্বা বাঁশের লাঠি হাতে, কণ্ঠস্বরটা ভাঙা ভাঙা গোছের। বোধ হয় সকলে জানেন, আজ শান্তিনিকেতনে যে অতি-প্রাচীন যুগল ছাতিম গাছ মালতীলতায় আচ্ছন্ন, এককালে মস্ত মাঠের মধ্যে ঐ দুটি ছাড়া আর গাছ ছিল না। ঐ গাছতলা ছিল ডাকাতের আড্ডা। ছায়া-প্রত্যাশী অনেক ক্লান্ত পথিক এই ছাতিমতলায় হয় ধন নয় প্রাণ নয় দুইই হারিয়েছে সেই শিথিল রাষ্ট্র-শাসনের কালে। এই সর্দার সেই ডাকাতি কাহিনীর শেষ পরিচ্ছেদের শেষ পরিশিষ্ট বলেই খ্যাত। বামাচারী তান্ত্রিক শাক্তের এই দেশে মা-কালীর খর্পরে এ যে নররক্ত জোগায় নি তা আমি বিশ্বাস করি নে। আশ্রমের সম্পর্কে কোনো রক্তচক্ষু রক্ত-তিলকলাঞ্ছিত ভদ্র বংশের শাক্তকে জানতুম যিনি মহামাংসপ্রসাদ ভোগ করেছেন বলে জনশ্রুতি কানে এসেছে।

একদা এই দুটিমাত্র ছাতিমগাছের ছায়া লক্ষ্য করে দূরপথযাত্রী পথিকেরা বিশ্রামের আশায় এখানে আসত। আমার পিতৃদেবও রায়পুরের ভুবন সিংহের বাড়িতে নিমন্ত্রণ সেরে পালকি করে যখন একদিন ফিরছিলেন তখন মাঠের মাঝখানে এই দুটি গাছের আহ্বান তাঁর মনে এসে পৌঁচেছিল। এইখানে



শান্তির প্রত্যাশায় রায়পুরের সিংহদের কাছ থেকে এই জমি তিনি দান গ্রহণ করেছিলেন। একখানি একতলা বাড়ি পত্তন করে এবং রুক্ষ রিক্ত ভূমিতে অনেকগুলি গাছ রোপণ করে সাধনার জন্য এখানে তিনি মাঝে মাঝে আশ্রয় গ্রহণ করতেন। সেই সময়ে প্রায়ই তাঁর ছিল হিমালয়ে নির্জনবাস। যখন রেল-লাইন স্থাপিত হল তখন বোলপুর স্টেশন ছিল পশ্চিমে যাবার পথে, অন্য লাইন তখন ছিল না। তাই হিমালয়ে যাবার মুখে বোলপুরে পিতা তাঁর প্রথম যাত্রা-ভঙ্গ করতেন। আমি যে বারে তাঁর সঙ্গে এলুম সে বারেও ড্যালহৌসি পাহাড়ে যাবার পথে তিনি বোলপুরে অবতরণ করেন। আমার মনে

পড়ে সকালবেলায় সূর্য ওঠবার পূর্বে তিনি ধ্যানে বসতেন অসমাপ্ত জলশূন্য পুষ্করিণীর দক্ষিণ পাড়ির উপরে। সূর্যাস্তকালে তাঁর ধ্যানের আসন ছিল ছাতিমতলায়। এখন ছাতিম গাছ বেষ্টন করে অনেক গাছপালা হয়েছে, তখন তার কিছুই ছিল না, সামনে অবারিত মাঠ পশ্চিম দিগন্ত পর্যন্ত ছিল একটানা। আমার 'পরে কটি বিশেষ কাজের ভার ছিল। ভগবদ্‌গীতা-গ্রন্থে কতকগুলি শ্লোক তিনি চিহ্নিত করে দিয়েছিলেন, আমি প্রতিদিন কিছু কিছু তাই কপি করে দিতুম তাঁকে। তার পরে সন্ধ্যাবেলা খোলা আকাশের নীচে বসে সৌরজগতের গ্রহমণ্ডলের বিবরণ বলতেন আমাকে, আমি শুনতুম একান্ত ঔৎসুক্যের সঙ্গে। মনে পড়ে আমি তাঁর মুখের সেই জ্যোতিষের ব্যাখ্যা লিখে তাঁকে শুনিয়েছিলুম। এই বর্ণনা থেকে বোঝা যাবে শান্তিনিকেতনের কোন্ ছবি আমার মনের মধ্যে কোন্ রসে ছাপা হয়ে গেছে। প্রথমত সেই বালক-বয়সে এখানকার প্রকৃতির কাছ থেকে যে আমন্ত্রণ পেয়েছিলেম—এখানকার অনবরুদ্ধ আকাশ ও মাঠ, দূর হতে প্রতিভাত নীলাভ শাল ও তাল -শ্রেণীর সমুচ্চ শাখাপুঞ্জে শ্যামলা শান্তি, স্মৃতির সম্পদ-রূপে চিরকাল আমার স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত হয়ে

গেছে। তার পরে এই আকাশে এই আলোকে দেখেছি সকালে বিকালে পিতৃদেবের পূজার নিঃশব্দ নিবেদন, তার গভীর গাম্ভীর্য। তখন এখানে আর কিছুই ছিল না, না ছিল এত গাছপালা, না ছিল মানুষের এবং কাজের এত ভিড়, কেবল দূরব্যাপী নিস্তব্ধতার মধ্যে ছিল একটি নির্মল মহিমা।

তার পরে সেদিনকার বালক যখন যৌবনের প্রৌঢ়বিভাগে তখন বালকদের শিক্ষার তপোবন তাকে দূরে খুঁজতে হবে কেন। আমি পিতাকে গিয়ে জানালেম, শান্তিনিকেতন এখন প্রায় শূন্য অবস্থায়, সেখানে যদি একটি আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপন করতে পারি তা হলে তাকে সার্থকতা দেওয়া হয়। তিনি তখনই উৎসাহের সঙ্গে সম্মতি দিলেন। বাধা ছিল আমার আত্মীয়দের দিক থেকে। পাছে শান্তি-নিকেতনের প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটে যায় এই ছিল তাঁদের আশঙ্কা। এখনকার কালের জোয়ারজলে নানা দিক থেকে ভাবের পরিবর্তন আবর্ত রচনা করে আসবে না এ আশা করা যায় না—যদি তার থেকে এড়াবার ইচ্ছা করি তা হলে আদর্শকে বিশুদ্ধ রাখতে গিয়ে তাকে নির্জীব করে রাখতে হয়। গাছপালা জীবজন্তু প্রভৃতি প্রাণবান বস্তু মাত্রেরই মধ্যে একই সময়ে বিকৃতি ও সংস্কৃতি চলতেই থাকে, এই

বৈপরীত্যের ক্রিয়াকে অত্যন্ত ভয় করতে গেলে প্রাণের সঙ্গে ব্যবহার বন্ধ রাখতে হয়। এই তর্ক নিয়ে আমার সংকল্পসাধনে কিছুদিন প্রবলভাবেই ব্যাঘাত চলেছিল।

এই তো বাইরের বাধা। অপর দিকে আমার আর্থিক সংগতি নিতান্ত সামান্য ছিল, আর বিদ্যালয়ের বিধিব্যবস্থা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ছিলই না। সাধ্যমতো কিছু কিছু আয়োজন করছি আর এই কথা নিয়ে আমার আলাপ এগোচ্ছে নানা লোকের সঙ্গে, এমনি অগোচরভাবে ভিৎপত্তন চলছিল। কিন্তু বিদ্যালয়ের কাজে শান্তিনিকেতন আশ্রমকে তখন আমার অধিকারে পেয়েছিলেম। এই সময়ে একটি তরুণ যুবকের সঙ্গে আমার আলাপ হল, তাকে বালক বললেই হয়। বোধ করি আঠারো পেরিয়ে সে উনিশে পড়েছে। তার নাম সতীশচন্দ্র রায়, কলেজে পড়ে, বি.এ. ক্লাসে। তার বন্ধু অজিত্‌কুমার চক্রবর্তী সতীশের লেখা কবিতার খাতা কিছুদিন পূর্বে আমার হাতে দিয়ে গিয়েছিল। পড়ে দেখে আমার সন্দেহমাত্র ছিল না যে, এই ছেলেটির প্রতিভা আছে, কেবলমাত্র লেখবার ক্ষমতা নয়। কিছু-দিন পরে বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে সতীশ এলেন আমার কাছে। শান্ত নম্র স্বল্পভাষী সৌম্যমূর্তি, দেখে

মন স্বতই আকৃষ্ট হয়। সতীশকে আমি শক্তিশালী বলে জেনেছিলেম বলেই তার রচনায় যেখানে শৈথিল্য দেখেছি স্পষ্ট করে নির্দেশ করতে সংকোচ বোধ করি নি। বিশেষভাবে ছন্দ নিয়ে তার লেখার প্রত্যেক লাইন ধরে আমি আলোচনা করেছি। অজিত আমার কঠোর বিচারে বিচলিত হয়েছিল কিন্তু সতীশ সহজেই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করে নিতে পারলে। অল্প দিনেই সতীশের যে পরিচয় পাওয়া গেল



আমাকে তা বিস্মিত করেছিল। যেমন গভীর তেমনি বিস্তৃত ছিল তার সাহিত্যরসের অভিজ্ঞতা। ব্রাউনিঙের কবিতা সে যেরকম করে আত্মগত করেছিল এমন দেখা যায় না। শেক্সপীয়রের রচনায় যেমন ছিল তার অধিকার তেমনি আনন্দ। আমার এই বিশ্বাস দৃঢ় ছিল যে, সতীশের কাব্যরচনায় একটা বলিষ্ঠ নাট্যপ্রকৃতির বিকাশ দেখা দেবে, এবং সেই

দিক থেকে সে একটা সম্পূর্ণ নতুন পথের প্রবর্তন করবে বাংলাসাহিত্যে। তার স্বভাবে একটি দুর্লভ লক্ষণ দেখেছি, যদিও তার বয়স কাঁচা তবু নিজের রচনার 'পরে তার অন্ধ আসক্তি ছিল না। সেগুলিকে আপনার থেকে বাইরে রেখে সে দেখতে পারত, এবং নির্মমভাবে সেগুলিকে বাইরে ফেলে দেওয়া তার পক্ষে ছিল সহজ। তাই তার সেদিনকার লেখার কোনো চিহ্ন অনতিকাল পরেও আমি দেখি নি। এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যেত, তার কবিস্বভাবের যে বৈশিষ্ট্য ছিল তাকে বলা যেতে পারে বহিরাশ্রয়িতা বা অব্‌জেক্‌টিভিটি। বিশ্লেষণ ও ধারণা শক্তি তার যথেষ্ট ছিল, কিন্তু স্বভাবের যে পরিচয় আমাকে তার দিকে অত্যন্ত আকর্ষণ করেছিল সে তার মনের স্পর্শচেতনা। যে জগতে সে জন্মেছিল তার কোথাও ছিল না তার ঔদাসীন্য। একই কালে ভোগের দ্বারা এবং ত্যাগের দ্বারা সর্বত্র আপন অধিকার প্রসারিত করবার শক্তি নিয়েই সে এসেছিল। তার অনুরাগ ছিল আনন্দ ছিল নানা দিকে ব্যাপক কিন্তু তার আসক্তি ছিল না। মনে আছে আমি তাকে একদিন বলেছিলেম, তুমি কবি ভর্তৃহরি, এই পৃথিবীতে তুমি রাজা এবং তুমি সন্ন্যাসী।

সে সময়ে আমার মনের মধ্যে নিয়ত ছিল শান্তি-

নিকেতন আশ্রমের সংকল্পনা। আমার নতুন-পাওয়া বালক-বন্ধুর সঙ্গে আমার সেই আলাপ চলত। তার স্বাভাবিক ধ্যানদৃষ্টিতে সমস্তটাকে সে দেখতে পেত প্রত্যক্ষ। উতঙ্কের যে উপাখ্যানটি সে লিখেছিল তাতে সেই ছবিটিকে সে আঁকতে চেষ্টা করেছে।

অবশেষে আনন্দের উৎসাহ সে আর সম্বরণ করতে পারলে না। সে বললে, আমাকে আপনার কাজে নিন। খুব খুশি হলেম কিন্তু কিছুতে তখন রাজি হলেম না। অবস্থা তাদের ভালো নয় জানতেম। বি.এ. পাশ করে এবং পরে আইনের পরীক্ষা দিয়ে সে সংসার চালাতে পারবে, তার অভিভাবকদের এই ইচ্ছা ছিল সন্দেহ নেই। তখনকার মতো আমি তাকে ঠেকিয়ে রেখে দিলেম।

এমন সময় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার পরিচয় ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। আমার নৈবেদ্যের কবিতাগুলি প্রকাশ হচ্ছিল তার কিছুকাল পূর্বে। এই কবিতাগুলি তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। তাঁর সম্পাদিত Twentieth Century পত্রিকায় এই রচনাগুলির যে প্রশংসা তিনি ব্যক্ত করেছিলেন সেকালে সেরকম উদার প্রশংসা আমি আর কোথাও পাই নি। বস্তুত এর অনেক কাল পরে এই সকল কবিতার কিছু অংশ এবং খেয়া ও গীতাঞ্জলি থেকে এই

জাতীয় কবিতার ইংরেজি অনুবাদের যোগে যে সম্মান পেয়েছিলেম তিনি আমাকে সেইরকম অকুণ্ঠিত সম্মান দিয়েছিলেন সেই সময়েই। এই পরিচয় উপলক্ষেই তিনি জানতে পেরেছিলেন আমার সংকল্প, এবং খবর পেয়েছিলেন যে, শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয়-স্থাপনের প্রস্তাবে আমি পিতার সম্মতি পেয়েছি। তিনি আমাকে বললেন, এই সংকল্পকে কার্যে প্রতিষ্ঠিত করতে বিলম্ব করবার কোনো প্রয়োজন নেই। তিনি তাঁর কয়েকটি অনুগত শিষ্য ও ছাত্র নিয়ে আশ্রমের কাজে প্রবেশ করলেন। তখনই আমার তরফে ছাত্র ছিল রথীন্দ্রনাথ ও তার কনিষ্ঠ শমীন্দ্রনাথ। আর অল্প কয়েক জনকে তিনি যোগ করে দিলেন। সংখ্যা অল্প না হলে বিদ্যালয়ের সম্পূর্ণতা অসম্ভব হত। তার কারণ, প্রাচীন আদর্শ অনুসারে আমার এই ছিল মত যে, শিক্ষাদানব্যাপারে গুরু ও শিষ্যের সম্বন্ধ হওয়া উচিত আধ্যাত্মিক। অর্থাৎ শিক্ষা দেওয়াটা গুরুর আপন সাধনারই প্রধান অঙ্গ। বিদ্যার সম্পদ যে পেয়েছে তার নিজেরই নিঃস্বার্থ দায়িত্ব সেই সম্পদ দান করা। আমাদের সমাজে এই মহৎ দায়িত্ব আধুনিক কাল পর্যন্ত স্বীকৃত হয়েছে। এখন তার লোপ হচ্ছে ক্রমশই।

তখন যে কয়টি ছাত্র নিয়ে বিদ্যালয়ের আরম্ভ হল

তাদের কাছ থেকে বেতন বা আহার্য-ব্যয় নেওয়া হত না, তাদের জীবনযাত্রার প্রায় সমস্ত দায় নিজের স্বল্প সম্বল থেকেই স্বীকার করেছি। অধ্যাপনার অধিকাংশ ভার যদি উপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত রেবাচাঁদ— তাঁর এখনকার উপাধি অণিমানন্দ—বহন না করতেন তা হলে কাজ চালানো একেবারে অসাধ্য হত। তখনকার আয়োজন ছিল দরিদ্রের মতো, আহারব্যবহার ছিল দরিদ্রের আদর্শে। তখন উপাধ্যায় আমাকে যে



গুরুদেব উপাধি দিয়েছিলেন আজ পর্যন্ত আশ্রমবাসীদের কাছে আমাকে সেই উপাধি বহন করতে হচ্ছে। আশ্রমের আরম্ভ থেকে বহুকাল পর্যন্ত তার আর্থিক ভার আমার পক্ষে যেমন দুর্বহ হয়েছে, এই উপাধিটিও তেমনি। অর্থকৃচ্ছ্র এবং এই উপাধি কোনোটাকেই আরামে বহন করতে পারি নে কিন্তু দুটো বোঝাই যে ভাগ্য আমার স্কন্ধে চাপিয়েছেন

তাঁর হাতের দানস্বরূপ এই দুঃখ এবং লাঞ্ছনা থেকে শেষ পর্যন্তই নিষ্কৃতি পাবার আশা রাখি নে।

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের সূচনার মূল কথাটা বিস্তারিত করে জানালুম। এইসঙ্গে উপাধ্যায়ের কাছে আমার অপরিশোধনীয় কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি।* তার পরে সেই কবিবালক সতীশের কথাটাও শেষ করে দিই।

বি.এ. পরীক্ষা তার আসন্ন হয়ে এল। অধ্যাপকেরা তার কাছে আশা করেছিল খুব বড়ো রকমেরই কৃতিত্ব। ঠিক সেই সময়েই সে পরীক্ষা দিল না। তার ভয় হল সে পাশ করবে। পাশ করলেই তার উপরে সংসারের যে সমস্ত দাবি চেপে বসবে তার পীড়ন ও প্রলোভন থেকে মুক্তি পাওয়া পাছে তার পক্ষে অসাধ্য হয় এইজন্যেই সে পিছিয়ে গেল শেষ মুহূর্তে। সংসারের দিক থেকে জীবনে সে একটা মস্ত ট্র্যাজিডির পত্তন করলে। আমি তার আর্থিক অভাব কিছু পরিমাণে পূরণ করবার

---

* কেহ কেহ এমন কথা লিখেছেন যে, উপাধ্যায় ও রেবাচাঁদ খৃস্টান ছিলেন, তাই নিয়ে পিতৃদেব আপত্তি করেছিলেন। এ কথা সত্য নয়। আমি নিজে জানি এই কথা তুলে আমাদের কোনো আত্মীয় তাঁর কাছে অভিযোগ করেছিলেন। তিনি কেবল এই কথাটি বলেছিলেন, তোমরা কিছু ভেবো না। ওখানকার জন্যে কোনো ভয় নেই। আমি ওখানে শান্তং শিবমদ্বৈতমের প্রতিষ্ঠা করে এসেছি।

যতই চেষ্টা করেছি কিছুতেই তাকে রাজি করতে পারি নি। মাঝে মাঝে গোপনে তাদের বাড়িতে পাঠিয়েছি টাকা। কিন্তু সে সামান্য। তখন আমার বিক্রি করবার যোগ্য যা-কিছু ছিল প্রায় সব শেষ হয়ে গেছে—অন্তঃপুরের সম্বল এবং বাইরের সম্বল। কয়েকটা আয়জনক বইয়ের বিক্রয়স্বত্ব কয়েক বৎসরের মেয়াদে দিয়েছি পরের হাতে। হিসাবের দুর্বোধ জটিলতায় সে মেয়াদ অতিক্রম করতে অতি দীর্ঘকাল লেগেছে। সমুদ্রতীরবাসের লোভে পুরীতে একটা বাড়ি করেছিলুম। সে বাড়ি একদিনও ভোগ করবার পূর্বে আশ্রমের ক্ষুধার দাবিতে বিক্রি হয়ে গেল। তার পরে যে সম্বল বাকি রইল তাকে বলে উচ্চহারের সুদে দেনা করবার ক্রেডিট। সতীশ জেনেশুনেই এখানকার সেই অগাধ দারিদ্র্যের মধ্যে ঝাঁপ দিয়েছিল প্রসন্ন মনে। কিন্তু তার আনন্দের অবধি ছিল না—এখানকার প্রকৃতির সংসর্গের আনন্দ, সাহিত্যসম্ভোগের আনন্দ, প্রতি মুহূর্তে আত্মনিবেদনের আনন্দ।

এই অপর্যাপ্ত আনন্দ সে সঞ্চার করত তার ছাত্রদের মনে। মনে পড়ে কতদিন তাকে পাশে নিয়ে শালবীথিকায় পায়চারি করেছি নানা তত্ত্বের আলোচনা করতে করতে—রাত্রি এগারোটা দুপুর

হয়ে যেত—সমস্ত আশ্রম হত নিস্তব্ধ নিদ্রামগ্ন। তারই কথা মনে করে আমি লিখেছি—

কতদিন এই পাতা-ঝরা
বীথিকায়, পুষ্পগন্ধে বসন্তের আগমনী-ভরা
সায়াহ্নে দুজনে মোরা ছায়াতে অঙ্কিত চন্দ্রালোকে
ফিরেছি গুঞ্জিত আলাপনে। তার সেই মুগ্ধ চোখে
বিশ্ব দেখা দিয়েছিল নন্দনমন্দার রঙে রাঙা।
যৌবনতুফান-লাগা সেদিনের কত নিদ্রাভাঙা
জ্যোৎস্না-মুগ্ধ রজনীর সৌহার্দ্যের সুধারসধারা
তোমার ছায়ার মাঝে দেখা দিল, হয়ে গেল সারা।
গভীর আনন্দক্ষণ কতদিন তব মঞ্জরীতে
একান্ত মিশিয়াছিল একখানি অখন্ড সংগীতে
আলোকে আলাপে হাস্যে, বনের চঞ্চল আন্দোলনে,
বাতাসের উদাস নিশ্বাসে।—

এমন অবিমিশ্র শ্রদ্ধা, অবিচলিত অকৃত্রিম প্রীতি, এমন সর্বভারবাহী সর্বত্যাগী সৌহার্দ্য জীবনে কত যে দুর্লভ তা এই সত্তর বৎসরের অভিজ্ঞতায় জেনেছি। তাই সেই আমার কিশোর বন্ধুর অকাল তিরোভাবের বেদনা আজ পর্যন্ত কিছুতেই ভুলতে পারি নি।

এই আশ্রমবিদ্যালয়ের সুদূর আরম্ভ-কালের প্রথম সংকল্পন, তার দুঃখ তার আনন্দ, তার অভাব তার পূর্ণতা, তার প্রিয় সঙ্গ, প্রিয় বিচ্ছেদ, নিষ্ঠুর

বিরুদ্ধতা ও অযাচিত আনুকূল্যের অল্পই কিছু আভাস দিলেম এই লেখায়। তার পরে শুধু আমাদের ইচ্ছা নয়, কালের ধর্ম কাজ করছে; এনেছে কত পরিবর্তন, কত নতুন আশা ও ব্যর্থতা, কত সুহৃদের অভাবনীয় আত্মনিবেদন, কত অজানা লোকের অহৈতুক শত্রুতা, কত মিথ্যা নিন্দা ও প্রশংসা, কত দুঃসাধ্য সমস্যা—আর্থিক ও পারমার্থিক। পারিতোষিক পাই বা না পাই, নিজের ক্ষতি করেছি সাধ্যের শেষ সীমা পর্যন্ত—অবশেষে ক্লান্ত দেহ ও জীর্ণ স্বাস্থ্য নিয়ে আমারও বিদায় নেবার দিন এল—প্রণাম করে যাই তাঁকে যিনি সুদীর্ঘ কঠোর দুর্গম পথে আমাকে এতকাল চালনা করে নিয়ে এসেছেন। এই এতকালের সাধনার বিফলতা প্রকাশ পায় বাইরে, এর সার্থকতার সম্পূর্ণ প্রমাণ থেকে যায় অলিখিত ইতিহাসের অদৃশ্য অক্ষরে।

প্র আশ্বিন ১৩৪০

